বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম. এ.
অধ্যক্ষ
ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা
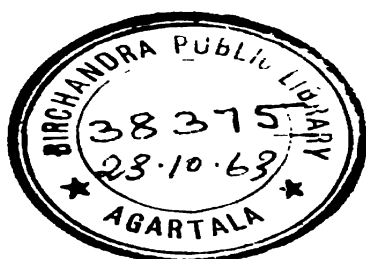
সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়

১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ১১ বৎসরের বালক মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই বিখ্যাত পত্রিকাটি চার বৎসর সম্পাদনা করিয়াছিলেন। নিজ সম্পাদিত কাগজে তিনি উপন্যাস, রম্যরচনা, বিজ্ঞান, সংগীত, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রভৃতি নিয়মিতভাবেই লিখিতেন। শেষ দিকে এমন হইয়াছিল যে, বঙ্গদর্শনের উচ্চ মান রক্ষার জন্য কাগজের প্রায় বার আনা লেখা তাঁহাকে একাই লিখিতে হইত।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক ছিলেন। তাই সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নিকট হইতে 'বঙ্গদর্শন' লইয়া পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই এই পত্রিকাখানি পাঠ করিতেন।

'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পরে তিনি তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে লিখিয়াছেন :—

"তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার,

সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেব-কাওলি', সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য ! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব বাহিনী ও পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

'বঙ্গদর্শন' বাহির হইবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস (১৮৫৬), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯)—এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃণালিনী যখন প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ৮ বৎসর।

মনে হয়, কিশোর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সহিত সর্ব প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে প্রথম সংখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যায় অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনাও ছিল। আর বঙ্গদর্শনের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক রচনাও থাকিত।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সহিত প্রথম বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম চোখে দেখেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামক কলেজের পুরাতন ও নূতন ছাত্রদের একটি বার্ষিক উৎসব সভায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রথম দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন ঃ—

"তাঁহাকে যখন প্রথম দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটা বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন, কোন এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব। সেই ভরসায় আমাকেও মিলন সভায় কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন।...

সেই সম্মিলন সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটা দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া ছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম, তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া একদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে, সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল।

বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন ; কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না। এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার

যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব, তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রথম দর্শনের কথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেও তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'র এই কথাগুলিই একটু পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছেন। যেমন :—

"সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকত কুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলন সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুক-প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর-কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু।"

চন্দ্রনাথ বসুও এই 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' সভাতেই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন। তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন—

'...'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। *

আমি দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের সহকারী-সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতার 'মরকত-কুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যেভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম, বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়াইয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন।" †

এই 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' সভায় রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, আর বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৩৮।

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে লিখিয়াছেন: 'সেকালে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি বার্ষিক সভা বসিত। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭৬ জানুয়ারী) তিনিই (চন্দ্রনাথ বসু) উদ্যোগী হইয়া রবীন্দ্রনাথকে সভায় লইয়া যান।'

চন্দ্রনাথ বসুর লেখা হইতে কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' শুধু হিন্দু কলেজের পুরাতন ছাত্রদের নয়, সকল কলেজের পুরাতন ও নূতন ছাত্রদের সভা ছিল।

† দ্রঃ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের উপর:রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের উপর এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকার * প্রথম বর্ষেই (১২৮৪ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। †

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের আলোচনায় ট্র্যাজেডির উত্থাপন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন—

"...ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরও নামিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটি উদাহরণ মিলিবে। 'সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি 'বিষবৃক্ষ' ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দ-নন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের

* 'ভারতী' রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীর কাগজ হইল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিকে কয়েক বৎসর ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরে এক সময় রবীন্দ্রনাথও ভারতীর সম্পাদক হইয়াছিলেন।

† রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অল্প বয়সের এই আক্রমণাত্মক প্রবন্ধের জন্য পরে অবশ্য আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি 'ভারতীর' সম্পাদক-চক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বে আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদ বধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দেবার ক্ষমতাটা খুব তীব্র হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।'

মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সের্মিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না।"

পরের বৎসরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তকের' উপর একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক'টি সেই সবে মাত্র বাহির হইয়াছিল। 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা ও মানস' এই কবিতা পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তকের উপর রবীন্দ্রনাথের সেই সমালোচনা প্রবন্ধটি 'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষের (১২৮৫ সনে) ভাদ্র সংখ্যায় ২৩৪—৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সমালোচনা প্রবন্ধটিতে কিন্তু লেখক হিসাবে কাহারও নাম ছিল না। তবে অনেকেই তখন বুঝিয়াছিলেন যে, উহা রবীন্দ্রনাথের লেখা। পরবর্তী কালে সজনীকান্ত দাসও এইরূপ অনুমান করিয়া রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার নিজের রচনা বলিয়াই সজনীবাবুর কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন। *

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তকের' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্কিমবাবুর কবিতা পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না। জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ—সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না। বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদ গন্ধহীন, কিছুই না হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

* দ্রঃ : সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ—জীবন ও সাহিত্য'

প্রথম কবিতা পৃথিরাজ মহিষী সংযুক্তার বিষয়।.. সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়—যাহাতে আর্য-গৌরবের কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।—অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটির কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে—অসঙ্গত মেদস্ফীত রোগীর ন্যায় ইহার লাবণ্য-শ্রী নাই—জীবনের আভাষ মাত্রও আছে কিনা সন্দেহ।”

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কবিতা-পুস্তকে’র অনেকগুলি কবিতা লইয়াই একে একে তীব্র আলোচনা করিয়াছেন।

শেষে লিখিয়াছেন—“সমস্ত কবিতা-পুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটি মাত্র কথা বলিব—বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতা খানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, ভাল একজন উপন্যাস লেখক, ভাল কবি হইতে পারেন না।”

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ কলেজ 'রি-ইউনিয়নে'র সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার পর হইতেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এবং এই আগ্রহের বশেই একদিন তিনি একাই. বিনা পরিচয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম সাক্ষাতের কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে, বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।" '

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক বার হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথম বার তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আলাপের সময় খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদি যথেষ্ট সমাদরের সহিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, অযাচিতভাবে যাওয়ার জন্য এবং নিজেকে নিতান্ত অর্বাচীন ভাবিয়া, রবীন্দ্রনাথের মনে যে লজ্জা বোধ হইয়াছিল, তাহা আর তাঁহার মনেই আসিত না।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তখন যে উচ্চ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, তাহার হয়ত কারণও ছিল। যেমন:— বালক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের ও তাঁহার নিজের কবিতা-পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করার জন্য তাঁহাকে উদ্ধত ভাবা। দ্বিতীয়তঃ, তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তেমন কোনরূপ স্ফুরণ না দেখার জন্যও হইতে পারে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় হাওড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব। এই বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক দিন ধরিয়া বেশ একটা বিবাদ চলিয়াছিল। বিবাদের কারণটি ছিল এই:—

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক মোকদ্দমায় এক বৃদ্ধা আসামীকে নির্দোষ জানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়িয়া দেন। বাক্‌ল্যাণ্ড চাহিয়াছিলেন, আসামীর শাস্তি হউক। তাই আসামী মুক্তি পাওয়ায় বাক্‌ল্যাণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং রাগের মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের উপর এক মন্তব্য লেখেন। এই মন্তব্য লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রও সাহেবের উপর মহা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং সাহেবকে জানান যে, এজন্য তাঁহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে, নচেৎ তিনি কমিশনারকে সমস্ত কথা জানাইবেন। সাহেব এক মাসের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা না চাওয়ায়, শেষে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কথা কমিশনারকে জানান। তখন অবশ্য বাক্‌ল্যাণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার রায়ের উপর যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করেন।

উপরওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যখন এইরূপ বিবাদ চলিতেছিল এবং এই বিবাদ লইয়া যখন তিনি খুবই বিব্রত ছিলেন, ঠিক সেই সময়টিতেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র ঝঞ্ঝাটের জন্য হয়ত রবীন্দ্রনাথকে ঠিক সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এমনও হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের অল্প কয়েকদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই পরিচয় লাভের যে উপলক্ষটি ঘটিয়াছিল, তাহা এই:—

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে বিদ্বজ্জন সমাগম সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ১৩ বৎসর। এই বিদ্বজ্জন সমাগম সভার ৭ম বার্ষিক উৎসব সভায় ১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল। সেদিনকার সভার একটি আমন্ত্রণ পত্র আমি দেখিয়াছি। সেই আমন্ত্রণ পত্রটি এইরূপ:—

বিদ্বজ্জন সমাগম।

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃত্যুশ্চাপ্যমৃতায়তে
বিপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমাৎ।

সবিনয় নিবেদন

১৬ ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ভারতী উৎসব হইবে, এবং সেই উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামক অভিনব গীতিনাট্য অভিনীত হইবে। আপনি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭॥০ ঘটিকার সময় উৎসব আরম্ভ।
৮॥০ ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ।
এই পত্র প্রবেশপত্র স্বরূপে দ্বারদেশে গৃহীত হইবে।

এই আমন্ত্রণ পত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় প্রথমে ভারতী উৎসব বা সাহিত্য সভা হয়, তাহার পর এই উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকাভিনয় হয়। আরও দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের-

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, ঐ বিদ্বজ্জন সমাগম সভার আহ্বায়ক।

ঐদিন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকাভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বাড়ীর আরও অনেকে দস্যু, ব্যাধ প্রভৃতির ভূমিকায় নামিয়া ছিলেন।

বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় যে বহু গণ্যমান্য বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন, তাহা সভার নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়। এই সভার সপ্তম বার্ষিক উৎসব সভায় সেদিন ভারতী উৎসবে এবং বাল্মীকি প্রতিভা নাটকাভিনয়েও বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি দর্শক শ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঐ সময় তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থখানি রচনা করিতেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় দেখিয়া অথবা গ্রন্থখানি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁহার গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেন। *

* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বাল্মীকি যখন ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া শূন্য হৃদয়ে একা বনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ক্রৌঞ্চ দম্পতির একটিকে ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগম শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

এই কবিতাটি বাহির হইয়াছিল। এবং ঠিক সেই সময়েই সরস্বতীও কানন পথে আসিয়া তাঁহার বীণাখানি বাল্মীকিকে দিয়া যান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থের এই অংশটি অনুকরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের রচনা কৌশলে এবং রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি পরে 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয় গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিয়াছেন।" *

* বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক ছিলেন। তবে বঙ্গদর্শনে 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা এ কথা স্বয়ং হরপ্রসাদও বলিয়া গিয়াছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—'এই গ্রন্থখানি (বাল্মীকির জয়) সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়, বঙ্গদর্শনে (১২৮৭ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন)। তখনও রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষে উহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় হয়। অতঃপর হরপ্রসাদ তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থখানি সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করেন (১২৮৮) ভাদ্র। এই গ্রন্থের শেষাংশ (৪র্থ-৬ষ্ঠ খণ্ড) যে রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গদর্শনের বিচক্ষণ সমালোচকের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় নাই।'

প্রভাতবাবুর এই লেখাটির মধ্যে কিছু ভুল আছে। যেমন : - (১) হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয় ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ফাল্গুন সংখ্যায় হরপ্রসাদের সাহিত্য বিষয়ক অন্য প্রবন্ধ ছিল।

(২) হরপ্রসাদ তাঁহার ৮ খণ্ডে বা অধ্যায়ে সমাপ্ত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে একমাত্র চতুর্থ খণ্ডের একটি পরিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বাল্মীকির কথা থাকিলেও সে অন্য কথা, আর ষষ্ঠ খণ্ডে কোন পরিচ্ছেদে বাল্মীকির নামই নাই। শুধু বিশ্বামিত্রের কাহিনী। বঙ্গদর্শনের বিচক্ষণ সমালোচকও একটি পরিচ্ছেদের কথাই বলিয়াছিলেন।

(৩) হরপ্রসাদ তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থ প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়িয়া গ্রন্থের সংশোধন ও পরিবর্তন করেন নাই। 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের পরের মাসে, বঙ্গদর্শনের চৈত্র সংখ্যায় হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, গ্রন্থ প্রকাশের সময়ও তাহাই অপরিবর্তিত রাখিয়া ছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য ও সারস্বত সমাজ

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে হাওড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হইয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি বৌবাজার ষ্ট্রীটে থাকিতেন। তখন তাঁহার বাসায় একরূপ প্রতিদিনই সন্ধ্যায় সাহিত্যিক-বৈঠক বসিত। সেই বৈঠকে আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র ইঁহারা নিয়মিত ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথও সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যাইতেন। ঐ সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে খুবই স্নেহের সহিত গ্রহণ করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর কাজ বুঝাইয়া দিয়া আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সেদিন ছিল ১১ই মাঘ। ঐ দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া যান।

এই ১১ই মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে লইয়া যান, একথা সৃজনীকান্ত দাস তাঁহার শনিবারের চিঠিতে (১৩৪৫ আষাঢ়, বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে বঙ্কিম-সংখ্যা) ক্ষুদ্র বঙ্কিম-জীবনীতে প্রথম লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিয়া যে বঙ্কিম-জীবনীটি লেখেন, তাহাতেও ঐ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু কেন যে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া ঐ দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, সজনীবাবু সে কথার কোথাও উল্লেখ করেন নাই। কোনও বঙ্কিম-জীবনী, কি রবীন্দ্র-জীবনীতেও এ কথার উল্লেখ দেখিতেছি না। কেবল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিরাট রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে এক জায়গায় সজনীকান্ত দাসের ঐ কথাটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সজনীবাবু কোথায় জানিয়া বা পড়িয়া এই কথাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে হয় এই :—

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করিয়াও পরে আবার অন্যায়ভাবে তাঁহাকে সেই পদ হইতে সরাইয়া পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করিয়া ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ইংরাজ পরিচালিত স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ লইয়া তখন অনেক লেখালিখি করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত করায়, সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়ায়, এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া যাওয়ার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। সেটি এই :—

ঠিক এই সময়েই ১২৮৯ সালে বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন প্রায় সকল বিখ্যাত সাহিত্যসেবীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সংস্থাটির নাম ছিল—কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন বা সারস্বত সমাজ। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রকারে উন্নতি সাধন করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ হইতে প্রথমে একটি অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সেই অনুষ্ঠান পত্রে সংস্থার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সভ্যদের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। সভ্যদের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথেরও নাম ছিল।

১২৮৯ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়ীতে কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনের প্রথম সভা হয়। ২রা শ্রাবণ সভা হইলে, তাহার কয়েক মাস আগে হইতেই সাহিত্যিকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা, তাঁহাদের মতামত লওয়া, তারপর সম্মিলনের সুদীর্ঘ নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্য গঠন প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল। তাহা হইলেই, ঐ ১১ই মাঘ তারিখে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, এখানে সারস্বত সম্মিলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। সারস্বত সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সারস্বত সম্মিলন নাম বদল করিয়া

ইহার নাম করা হয়—সারস্বত সমাজ, এবং অনুষ্ঠান পত্রে প্রচারিত কয়েকটি নিয়মও কিছু কিছু বদল করা হয়। এই সম্মিলনে সর্বসম্মতি ক্রমে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র, ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহযোগী সভাপতি হন। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত এই সংস্থাটি কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

সারস্বত সমাজের এই অল্পায়ু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোকদের পরিত্যাগ করো—'হোমড়া-চোমড়া'দের লইয়া কোন কাজ হইবে না। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি ও সভায় যোগ দিতে রাজী হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে, যে কয়দিন সভা বাঁচিয়াছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন।...

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল। হোমড়া-চোমড়াদের একত্র করিয়া কোন কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে সারস্বত সমাজের কাজে না পাওয়া গেলেও, একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, সারস্বত সমাজ যতদিন চলিয়াছিল, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সহযোগী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিশ্চয়ই রীতিমত যোগাযোগ রাখিতে হইয়াছিল। এই যোগাযোগ স্থাপনের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হইবার সুযোগ হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন

সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়, ১২৮৯ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায় না।

এই সভার কিছুদিন আগেই (১২৮৮ সালে) রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা-সংগীত' কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-সংগীত পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সেই কবি-প্রতিভার স্ফুরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিয়া নাটকের গঠন-কৌশলে এবং রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই এই ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসেই রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সভায়, * যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র একগাছি মালা লইয়া যখন বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় পরাইতে আসেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মালাটি লইয়া রবীন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

এই ঘটনাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন— "বিবাহ সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন—'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যা-সংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন—'না'। তখন সন্ধ্যা-সংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেও এ কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন —'একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনও নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার প্রথম গৌরবের দিন।...তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

* রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার সহিত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর বিবাহ হইয়াছিল।

ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০২) রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দনের কথাটি এইরূপ লেখা ছিল :—

"বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। একবার একটি সভায় দেশের প্রধান প্রধান লেখকগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু সেই মালা ছড়াটি রবীন্দ্রনাথের গলায় সাদরে পরাইয়া দিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কাছে এ প্রকার সমাদর লাভ করা সাধারণ গৌরবের কথা নয়।"

'সখা ও সাথী'তে প্রকাশিত এই জীবনীটির মধ্যে যে কয়েকটি ভুল ছিল রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহা সংশোধন করিয়া ঐ পত্রিকার পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যায় এক চিঠি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তাঁহাকে অভিনন্দনের কথা-প্রসঙ্গে তিনি যাহা সংশোধন করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই :—"মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় কন্যা কর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইতে আসিলে, তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না—এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।' *

* বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বের লেখাগুলি হইতে তাঁহার এই লেখাটি যেন একটু স্তিমিত বা বেসুরা বলিয়াই মনে হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ আর রমেশচন্দ্রের নাম না করিয়া 'কন্যা কর্তৃপক্ষের কেহ' বলিয়াছেন এবং 'মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এখন এরূপ লিখিলেন কেন? এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, এই লেখাটির কয়েক মাস আগেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাই হয়ত তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁহার কিছুটা বিরূপ ভাব ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে নিজ কণ্ঠের মালা পরাইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সেই ঘটনার কিছুদিন আগে অথবা পরেই তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস * পড়িয়া স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসাসূচক পত্রটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে বলিয়াছেন :—

"সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে, তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম। সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা, তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে নিন্দে করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখে ছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করাল।...তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহ বাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার লক্ষণ দেখিয়া ; এইভাবে কখন তাঁহাকে নিজ কণ্ঠের মালা পরাইয়া, কখন বা স্বেচ্ছায় তাঁহার উপন্যাসের প্রশংসা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া ছিলেন। শুধু ইহাই নহে তিনি যেমন রমেশচন্দ্র দত্তকে বলিয়াছিলেন, 'রমেশ তুমি সন্ধ্যা-সংগীত পড়িয়াছ ?'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকটে সন্ধ্যা-সংগীতের কোন কবিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিকটেও স্বেচ্ছায় নবীন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার লেখার উচ্চ প্রশংসা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন কবি নবীনচন্দ্র সেনের নিকট কিভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"আমি বেহার হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রাতে

* বৌ-ঠাকুরাণীর হাট প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮-৮৯ সালে।

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটা দ্বিতল গৃহে ছিলেন। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। 'আনন্দমঠ' তখন বাহির হইয়াছে।…

বঙ্কিমবাবু সেইদিন সান্ধ্য-আহারের জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আরও কয়েকটি বন্ধুকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিবেন বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'রবি ঠাকুরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?' আমি বলিলাম—'যৎসামান্য এবং বহু দিনের।' তিনি বলিলেন—'তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত। He is a talented young man (তিনি একজন শক্তিশালী লোক)।'

সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হেমবাবু ও আরও কয়েকটি নিমন্ত্রিত উপস্থিত। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'রবি কোনও কারণে আসিতে পারেন নাই।'

বড় আনন্দে নানাবিধ সাহিত্যালাপে সন্ধ্যাটি কাটাইলাম। তাহার কিছুকাল পরে 'প্রচারে' 'রবির ছায়া' পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম, বুঝিলাম রবিবাবু কোনরূপে বঙ্কিমবাবুর শাণিত অভিমানে আঘাত করিয়াছেন। বিষয়টা কি, বুঝিলাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধ

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রচারের এই প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে দুটি হিন্দুর তুলনা করিয়াছিলেন—একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্মপরায়ণ, আর একজন আচারপরায়ণ কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমোক্ত হিন্দুটির সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—ঐ লোকটি কখনো মিথ্যা কথা বলে না, তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা বলেন।

প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, ইহার চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এক সভায় 'একটি পুরাতন কথা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেটি ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে লেখেন—'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে, নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।…কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং সেটি ঐ অগ্রহায়ণ মাসেই প্রচারে প্রকাশ করেন। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"…আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উওর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে।…কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশি প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি

দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে এই কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবিবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য।...

প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তার মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পর্দা পর্দা উঠিতেছে।...

কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন। ভাবিতেছিলেন, অর্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জুন আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা। অর্জুন বলিলেন—না হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া অর্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে 'সত্য'রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে 'সত্য'চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে —সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয় একটু বুঝাই।

রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth, মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই।......'সত্য' মিথ্যা' প্রাচীন কাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া কিছু নহে।

...এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ প্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল ?...

উপসংহারে রবীন্দ্রবাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এদেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশি পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। মৌখিক 'Lie direct' সম্বন্ধে তাহাদের যত আপত্তি—কার্যতঃ সমুদ্র প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। ...মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি... এই এত অল্প বয়সেও বাঙ্গলার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।"

এরপর রবীন্দ্রনাথ আবার পৌষের 'ভারতী'তে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ লিখিলেন। এবার অবশ্য তিনি তাঁহার লেখায় যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন :—

"বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি বিশেষের লেখার উত্তর দেওয়ার আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না, যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর মুখোমুখি উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নই, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার

সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়াই আমার জ্ঞান হইয়াছিল। তাই আমার কর্তব্য বিধায় আমার কর্তব্য কার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না, ভরসাও হয় না। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণ মাত্রই যে অন্যায়, এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্ম সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই সকলের প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।...

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, তবে তিনি বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। আমার সবিশেষ নিবেদন এই যে, আমি সরলভাবে যে সকল বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্যভাব গ্রহণ না করেন।" (ভারতী —১২৯১, পৌষ)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মূল 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে, যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই-খানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা কহেন, শুধু এই কথা কয়টি লিখিয়াছিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণোক্তির মহাভারতীয় কাহিনীটি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তিনি যদি প্রথমেই ঐ কাহিনীটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেন, তাহা হইলে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই বাদানুবাদটা আর হইত না।

বাঙলা সাহিত্য-জগতের সম্রাট প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সেদিন রবীন্দ্রনাথ যখন এই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মাত্র ২৩ বৎসরের যুবক। প্রবীণ ও নবীন, এই দুই মহাপ্রতিভাধরের সংঘর্ষ সেদিন অনেকের কাছে বেশ একটা কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই যে সংঘর্ষ এও অবশ্য ছিল খুবই ক্ষণিকের। কেন না গুণানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বরাবর যেমন স্নেহ করিতেন, তেমনি স্নেহ করিতে

লাগিলেন, আর রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গলা সাহিত্যিকদের গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। তাই, ঐ বাদানুবাদের মাত্র কয়দিন পরেই পৌষ মাসের 'প্রচারে' দেখি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও * প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সময় প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপযুক্ত আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একটি ক্ষমা-সুন্দর পত্র লিখিয়া নিজেদের মধ্যকার ক্ষণিকের বাদানুবাদের ধূলিমলিনতা মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক পত্রটি রবীন্দ্রনাথই কিভাবে কখন হারাইয়া ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার অল্প বয়সের চাপল্য হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই বাদপ্রতিবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর পত্রটির প্রসঙ্গে 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছিলেন—"ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। .. এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

* কবিতাটির নাম—'মথুরায়'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার যাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহার পর ১৮৮৩র ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮৮৫র জুলাই পর্যন্ত তিনি হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। হাওড়ায় এই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে বঙ্কিম-চন্দ্রের বাসা এবার কলিকাতার কলুটোলায় ভবানী দত্ত লেনে ছিল। তিনি এখান হইতেই হাওড়ায় যাতায়াত করিতেন। কেবল শেষদিকে কিছুদিন হাওড়ায় বাসা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় যখন ভবানী দত্ত লেনে থাকিতেন, তখন রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে যাইতেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন—

"তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড় হইয়াছি। সে সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি…

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় 'নব-জীবন' * মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন। আমিও তাহাতে দুটা একটা লেখা দিয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচারে একটি গান ও কোনো বৈষ্ণবপদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর নিকট আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন।

* ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়। এই 'নবজীবন' প্রকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গেও অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—সেই সময় কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাটরূপ বঙ্কিমবাবু বিরাজমান।

তাঁহাকে দেখিলে বড় খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।...

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন।"

১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে বীরভূম হইয়া বর্ধমানে আসেন। তিনি বর্ধমানে আসিয়া সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় উঠেন। দিন কয়েক পরে ইন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণিকে কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট লইয়া আসেন।

তর্কচূড়ামণি বৈশাখের শেষ দিকে কলিকাতায় ও কলিকাতার আশে পাশে ১০।১২ দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি প্রথম বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, কলিকাতার এলবার্ট হলে, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় শুধু উপস্থিতই ছিলেন না, তিনি ঐ সভায় সভাপতি হইয়া তর্কচূড়ামণিকে সাধারণের নিকট পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই তর্কচূড়ামণির কথায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়রীতে লিখিয়াছিলেন—

"একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রবিবাবু, আপনি (বঙ্কিমবাবু বরাবর আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন) শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন, আমি বলিলাম—না। তিনি বলিলেন— শুনিবেন তাহাতে জিনিষ আছে। আপনি আমার বাড়ীতে আসিবেন, সেই খানেই তাঁহার কথাবার্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।

কিন্তু শীঘ্রই এইখানে দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্কিমবাবুর admiration বড় বেশি দিন স্থায়ী হইল না। কৃষ্ণচরিত্র রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। একবার Albert Hallএ আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম।" দেশ, ১৩৬০ বৈশাখ, ২৬ পৃঃ ১০।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের সম্মুখে প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতেন। রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়ীতে, মাঝে মাঝে যাইতেন।

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১২৯৮, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) হইতে কয়েক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ঐ 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চাহিয়া ছিলেন।

'হিতবাদী' প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এ কথার উল্লেখ করিয়া এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।"

'সাধনা' কাগজের জন্যও লেখা চাহিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যাইতেন। সাধনা ১২৯৯—১৩০২ সাল পর্যন্ত চার বৎসর চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ৪র্থ বৎসরে সাধনার সম্পাদক ছিলেন। প্রথম তিন বৎসর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক হিসাবে থাকিলেও আসলে তিনিই সম্পাদনা করিতেন। সেই সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে লেখা চাহিতে যাইতেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখা দিতে পারেন নাই।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঐ সময় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন কাগজে লিখিতে না পারার কথা উত্থাপন করিয়া ছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেশবাবুর মধ্যে এইরূপ কথপোকথন হইয়াছিল :—

বঙ্কিমচন্দ্র—আমার লেখা ?...অন্ততঃ চারটি প্রবন্ধ না লিখলে হয় না। তা পেরে উঠ্‌ছি না।

সুরেশবাবু—একটাই দিন না।

বঙ্কিমচন্দ্র—তোমাকে একটা দিলে ত চলবে না। স্বর্ণকুমারী রয়েছেন। আমার নাতিদের জন্য খেলনা দিয়ে গেছেন, আমি ত সব বুঝি। তাঁর "ভারতী" আছে। রবি আসেন। জানো ত 'প্রচারে'র সময় একপালা হয়ে গেছে। তাঁর 'সাধনা' আছে। তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে। তারপর এক আছেন, আমার বেহাই দামোদরবাবু।

সুরেশবাবু—তাঁর 'প্রবাহ' ত নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র—তিনি 'নব্য ভারতের' জন্য ধরেছেন। সেদিন তাঁকে বলেছি, আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। এখন তিনটি লিখতে পারলে হয়। পেরে উঠব তা তো বলতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কৃষ্ণ-সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উভয়ে মিলিয়া এক সময়ে বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'পদরত্নাবলী' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। শ্রীশবাবু ঐ 'পদরত্নাবলী' এক খণ্ড তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রসংশা করিয়াছিলেন।

ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশবাবুর মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের 'কৃষ্ণ' সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে শ্রীশবাবু পত্র লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুকে লিখিত একপত্রে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৩০৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রিকায় লিখিয়াছেন:—

"১৮৮৫, পূজার পূর্বে 'প্রচার' পত্রে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র যে অংশ অর্থাৎ কৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন 'তুমি সম্রাট নও, মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না' প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষ ভাবে তাঁহার রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল। পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত, যুদ্ধে প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারী অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইয়াছিল এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিংসা-বৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক, অথচ হিংসার মত সমাজ-বিরোধী (anti-social) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সে সময়ে রবীন্দ্রবাবু ও আমার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' মুদ্রিত হইয়াছিল। এবং আমি উহার একখণ্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। কিছু দিন পরে নদীয়া জেলায় প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া যাই। পলাশীর অদূরে কালী গ্রামে অবস্থান কালে

বঙ্কিমবাবুর পত্রোত্তর আমার হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ চতুর্দশ বৎসরের কথা—কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রটি ১২৯২ সালের ২৫শে আশ্বিন তারিখে লেখা। সেই পত্রটি এই :—

প্রিয়তমেষু,

আমি হাঁপানীর পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম ভরসা করি শীঘ্রই চাকরি চিরস্থায়ী হইবে।

'পদরত্নাবলী' পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা—William the Silent)। ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ম যুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়া ছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্য চরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি— তাং ২৫শে আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, সেই সময় তিনি একখণ্ড 'কৃষ্ণচরিত্র' রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন, তাঁহার ঠিকানা জানিতেন না বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই দাদা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনজনের জন্য তিন খানি 'কৃষ্ণচরিত্র' দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় ঐ সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :—*

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

তিনখানি কৃষ্ণচরিত্র পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিঃ ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না। এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি তাং—১০ই আগষ্ট।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ, ১৩৪৯ হইতে চিঠিটি উদ্ধৃত।

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙ্গলাকে পরীক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা তখন সফল হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টার কিছুদিন পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে' 'শিক্ষার হের-ফের' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-বন্ধু লোকেন পালিত ঐ সময় রাজসাহীর জেলা জজ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারীতে গিয়া নৌকায় করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাজসাহীতে গিয়াছিলেন। তখন রাজসাহীতে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় থাকিতেন। তিনি ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যামোদী ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধটি লিখিয়া রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পড়েন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্য-পুস্তক বলি না।...তাহারা কেবল মাত্র শিক্ষা-পুস্তক।

...যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।...

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছু মাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ করিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে দক্ষিণেবামে দৃকপাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোন শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।...

ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত

গৃহের শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়—বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে।...

আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যে যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর গুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাধনায় রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটি পড়িয়া, রবীন্দ্রনাথকে তখন একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পত্রের কিছু অংশ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সমেত প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই অংশটি এই :—

"বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। ঐ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম। এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।'—কিন্তু কেন যে তাঁহার ক্ষীণ স্বর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মতো সভা 'অসংখ্য বালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্য বলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ পাঠকরা সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি বা কর্ণভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণচ্ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র

প্রভাকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রবীন্দ্র-জীবন কথা" নামক রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখিয়াছেনঃ—

"আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে ১৮৯৩ বা ১৩০০ সাল।···সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬১ অব্দে প্রথম ভারত কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট (Indian Council's Act) পাস হয়। তার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৮৯২ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নয়া আইন সংশোধিত হয়—ভারতীয় রাজনীতিকদের দাবী ছিল, প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্তনের। সে সব তো পূরণ হলই না, বরং তার উপর পরিষদের কয়েকটি আসনের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি খুব ভালভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। সরকারী চাকরিতে ভারতীয়দের ঢোকবার পথে অনেক বাধা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করা হ'ল। শিলিং ও টাকার বিনিময় মূল্যের মধ্যে এমন অর্থনৈতিক কারচুপি করা হ'ল যে, তাতে ভারতীয়দের কোটী কোটী টাকা লোকসান হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। এই সব এবং আরো অনেক ব্যাপারে শিক্ষিত ভারতীয়ের মন বিষিয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সরকারী পেন্সনভোগী, রায় বাহাদুর পর্যন্ত লিখলেন—'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্বগৌরব মনে করিব, ততদিন জাতিবৈর সমতার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।' দেশের মনোভাব এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন। কথা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র এই সভায় সভাপতি হবেন।···সভা হ'ল বিডন ষ্ট্রীটের 'চৈতন্য লাইব্রেরী'তে। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ সাক্ষাৎ। কয়েক দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ পাঠের সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্ব করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন :—

"একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনও নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্প-মাল্য পরাইয়া ছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদর-বাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে ভরসা করি, সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন।...সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্য-পথযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপে আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল। তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ-পাঠের সভা চৈতন্য লাইব্রেরীতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক লেখায় দেখিতেছি যে, রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভাটি চৈতন্য লাইব্রেরীতে নয়, জেনারেল এসেম্বলীতে (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) হইয়াছিল। চণ্ডীচরণবাবু সেদিন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

'মোগল-কুল-তিলক আকবর সাহকে আমরা সম্রাট-শিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আকবরের বিবিধ গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল রাজ-দরবারকে সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে জেনারেল এসেম্বলীর হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশি অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মেলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক, দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগতপ্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম স্মরণ নাই, তবে প্রসঙ্গক্রমে মোগল শাসনের উল্লেখ ছিল এবং আকবরের প্রশংসাও ছিল।

সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল। একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুক্কায়িত সত্য কথা প্রকাশ পাইল। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন—'আকবরের নামে দেশের লোকে এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার উচ্চ উদার-রাজনীতিজ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে মোগল অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন, এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতার লেশমাত্র ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের পরিণয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও না হয়, একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আকবর স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃতকার্য হইয়া ছিলেন মাত্র।'

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আপনি কাল আমায় খুব বাঁচিয়েছেন। এত লোকের জনতা হবে জানলে কি আমি যেতুম। আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লাবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়বেন। পরে আমি দু দশ কথায় আমার বক্তব্য শেষ করব। এ কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়?' এই 'ঐ রকম' কথার অর্থ এই যে, সেদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণে জেনারেল এসেম্বলীর স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহু লোক অতি কষ্টে কেবল দাঁড়াইয়া স্থান পাইয়া কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধ পাঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুক্ষভাবে, পরে অভদ্রোচিত ইতর বচন-বিন্যাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য

দর্শন আর কখন ঘটিয়াছিল কিনা জানি না। বঙ্কিমবাবুর নিশ্চই ঘটে নাই। সেই গোলটা থামাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ছিলাম, ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।' ”

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আকবরের প্রশংসাসূচক যে কথাগুলি ছিল, সেগুলি এই :—

“আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সী ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রীসভায়, হিন্দুবীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভায় আকবর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মন্তব্যটি করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম-স্মৃতি সভায় রবীন্দ্রনাথ

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কলিকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরীতে যে শোক-সভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিবেন স্থির করেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই সময় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহ্বান জানান।

নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, সভা করিয়া কোন মহৎ ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশের তিনি বিরোধী। হিন্দুরা ঐভাবে শোক প্রকাশ করে না। উহা বিলাতী প্রথা। তাই তিনি ঐরূপ সভায় যোগদান করিতে অক্ষম।

রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের এই কথার উত্তর হিসাবে তখন 'সাধনা'য় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই হিসাবে লোক-হিতৈষী কোন মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোক প্রকাশ করা অসঙ্গত নয়। বরং ইহা আমাদের একটি সামাজিক কর্তব্য।—রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছিলেন —পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে আমরা বহু জিনিষ গ্রহণ করিয়াছি ও করিতে বাধ্য হইয়াছি। শোকসভা অনুষ্ঠান তাহার অন্যতম। পাশ্চাত্য বলিয়াই তাহা বর্জনীয় হইতে পারে না।

নবীনচন্দ্র সভাপতি হইতে স্বীকৃত না হওয়ায় শেষে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঐ সভায় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি সভার প্রথমেই বলিয়াছিলেন :—

"অধিক দিনের কথা নহে, ইতিপূর্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ (ইংরেজ ও ভারতবাসী) পাঠ করিয়া ছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া

তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের যে কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তিনি তাঁহার এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি সেকালের 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল বাঙ্গলা-সাহিত্যের সব্যসাচী ও সাহিত্য-মহারথীই বলেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলা লেখকদিগের গুরু বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রথমে ১৩০১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পরে তিনি এই প্রবন্ধটিকে তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে স্থান দিয়া যান।

রবীন্দ্রনাথের এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির কিয়দংশ এইরূপ :—

"বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব প্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতা পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছুই নাই। তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্য ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল, তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য।...

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে, ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।...

রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

...বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন।...সাহিত্যে যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

বঙ্কিমচন্দ্রের যে মাসে মৃত্যু হয়, সেই ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপর একটি সমালোচনা লিখিয়া 'সাধনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা দেখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সমালোচনায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাই করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা, কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।···

সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয় ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জা-সমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্য কৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষ-বেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ—এ সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসংকোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে, কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

···রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখ-দুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল, অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর

সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না, তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

...পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে, ক্রমেই গভীরতর হইয়া, পর্বত ভাঙিয়া, পথ কাটিয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, মহাবলে অগ্রসর হইতেছে। সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকি মিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি ; তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলেব বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘ গম্ভীর গর্জন, কতক বা সুতীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তি বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।”

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের ‘ভারতী’তে—‘বাউলের গাথা’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস সম্বন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখিয়াছিলেন :—

“বঙ্কিমবাবু যখন ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লেখেন, তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।...কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোনো একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষ বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সেকথা আমরা কানেই আনি না।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঐতিহ্যাতিহাক উপন্যাস' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদ-সম্পদ হর্ষ-বিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি, কারণ সে-সমস্ত সুখ-দুঃখের কেন্দ্রমূল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আয়তনের প্রশংসা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বন্ধু লোকেন পালিতকে একবার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

'আমার মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড় হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিষ্টের অনুকরণে বাঙ্গলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তাহলে বড় অসহ্য হয়ে উঠত। এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয়—ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা।" সাধনা—১২৯৮ পৃঃ ৩২৪

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা "ছিন্নপত্রে"র একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল জাতীয় লোক হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙ্গালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভাল করে বলে নি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও রবীন্দ্রনাথ

১২৮৭ সালের চৈত্র মাস হইতে ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয় এবং ১২৮৯ সালেই উহা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের তখন ভাল লাগে নাই। সেকথা তিনি পত্রযোগে চন্দ্রনাথ বসুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন। তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানে সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। আনন্দমঠের সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন এক রকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaকে, যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ যে একটা প্রকাণ্ড আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কৈ? কেন তিনি তাঁহার আনন্দগুলিকে বৈশিষ্ট্য দিলেন না।" (রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে এরূপ বিরূপ মত রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও প্রচার করিয়াছেন। যেমন:—

শরৎচন্দ্রের ৫৫ তম জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য যে সভা আহ্বান করেন, তাহাতে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি স্থির করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য কারণ বশতঃ সভায় আসিতে পারেন নাই। তখন তিনি সভার উদ্যোক্তাদের অনুরোধে একটি লিখিত বাণী পাঠাইয়া দেন। সেই বাণীতে তিনি বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের ক্রম বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সংক্ষিপ্ত

ইতিহাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—
'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' তুলনায় ইহার সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। ইহার মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায় মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশার বিবরণে, তাহার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তাহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়িয়া বসিয়াছে, প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র।

'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মত অনেকে কিন্তু স্বীকার করেন না। যেমন, বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেন :—

"...এই রূপমোহের, এই ইন্দ্রিয়-পারবশ্যের চূড়ান্ত ট্রাজেডি—'আনন্দমঠ।' যাঁহারা এই উপন্যাসকে একখানি উদ্দেশ্যমূলক স্বদেশ প্রেমের কাব্য বলিয়াই সংক্ষেপে ইহার বিচার শেষ করেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কবি প্রতিভার সম্যক ধারণা করিতে পারেন নাই। এই উপন্যাসও 'সীতারামের' মতই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।...সকল বড় কাব্যের লক্ষণই এই যে, তাহাতে জীবনের একটা জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা কোন একটি বিশিষ্ট ভাব কল্পনার ঐক্যসূত্রে সুসম্বদ্ধ আকার ধারণ করে। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের কল্পনা সূত্রে কবি বঙ্কিম তাঁহার আজীবন সঞ্চিত গভীর ও জটিল অভিজ্ঞতাকেই একটি রসরূপ দান করিয়াছেন। দেশপ্রেমকেই পুরুষের একটি মহৎ ধর্মরূপে স্থাপন করিয়া তিনি সে একই সমস্যাকে বাস্তব ও আদর্শের বিরোধকে, দেহ-আত্মার দ্বন্দ্বকে—আরও সরল স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন ; যেন দেশপ্রেমের তাড়িত-শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের দেহ-মন-প্রাণকে তরলিত ও মথিত করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের মূল উপাদান পরীক্ষা করিয়াছেন। দেশপ্রেমরূপ একটা ভাবাবেগমূলক ধর্মের সংঘাতে, মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত কিছু সংস্কারকে বিধ্বস্ত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার শক্তি ও অশক্তির সীমা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌন-প্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্যপ্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, সংসার-ত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম ও সনাতন শাশ্বত পন্থা—এই সকলই একটি ভাব-সত্যের আশ্রয়ে সুসমাহিত হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি

নৈশগম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে যে একটি atmosphere বা মনোভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেজন্য চরিত্র বা ঘটনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন। এইজন্য 'আনন্দমঠ' কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যমূলক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রসরচনা।"

রবীন্দ্রনাথ আনন্দমঠকে উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ—আনন্দমঠে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়িয়া বসিয়াছে, প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র— বলায় তখন 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া ইহার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল। যেমন :—

"'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ও 'চিত্রাঙ্গদা' যুগের কয়েকটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের বহুতর উপন্যাস ও নাট্য উদ্দেশ্যমূলক। তিনি উদ্দেশ্য ছাড়া লিখতেই পারেন না।..." (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন—১৩৩৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহারই উত্তর হিসাবে মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—

'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে একদল সাহিত্যিক (অধিকাংশ রবীন্দ্র-শিষ্য) রব তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের যত বড় লেখকই হউন, তিনি যে উপন্যাসগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট আর্টের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে।...স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন ; তাহার দৃষ্টান্তে সৌখিন সাহিত্যিক মজলিসে যে উঁচুদরের সাহিত্য আলোচনা হইয়া থাকে, এবং যাহা মৌলিক সমালোচনা প্রবন্ধরূপে—বাঙ্গলা মাসিক অর্থাৎ হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রসিক পাঠকগণের দরবারে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বঙ্কিমবাবুকে অপদস্থ না করিলে আধুনিক হওয়া যায় না।...রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা, বিশেষতঃ এই শেষ বয়সে একটু বিচিত্র বটে, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম অতিশয় স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার প্রতিভা খুবই আত্মসচেতন ; এবং সেইজন্য আত্ম-সংস্কারকে অতিশয় অবোধ instinctকেই অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অন্য কোনও ভিন্নধর্মা শক্তিমান সাহিত্যিকের কবি-

কীর্তির মূল্য নিরূপণ করিবেন—তাঁহার সাহিত্য সমালোচনার যে ভঙ্গির পরিচয় আমরা বহু পূর্বেই পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, কবি-ব্যক্তিত্বের বহুত্বই তাঁহার যেমন কাম্য, তেমনই সমালোচনা বা যুক্তিচিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি বহু বচনের পক্ষপাতী। তা ছাড়া, সকল কালের সমবয়সী হওয়ার বা সর্বদা 'আপ-টু-ডেট' থাকিবার যে সাধনা, তাহাতে তিনি অতি মাত্রায় বিশ্বাসী ; তিনি বৃদ্ধ হইবেন না—এবং স্থাবরতাই স্থবিরতার লক্ষণ—সেজন্য স্থাবরতাকে বর্জন করিতে হইবে ; এমন একটা সংকল্প তাঁহার ইদানীন্তন সাহিত্যিক প্রয়াসগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কাল-ধর্মে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাতিল হইতে বসিয়াছেন, তখন অতিশয় সজাগ থাকিয়া সেই কালের অনুবর্তন করিতে না পারিলে, তিনিও বাতিল হইয়া যাইবেন—এ ভয় তাঁহার প্রবল। তাহার প্রমাণ অতি আধুনিকদের সঙ্গে বার বার রফা করিবার চেষ্টায় নিত্যই পাওয়া যাইতেছে।" পৌষ—১৩৪৩। (বঙ্কিম বরণ)

রবীন্দ্রনাথ ও 'রবীন্দ্র-শিষ্য'দের সম্বন্ধে মোহিতলাল যখন এই উক্তিটি করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত। রবীন্দ্রনাথ কি কোন 'রবীন্দ্র-শিষ্য' মোহিতলালের এই উক্তির উত্তর দিয়াছিলেন কি না জানি না।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দমঠ সম্বন্ধে কখন কখন উচ্চ প্রশংসা-সূচক কথা না বলিলেও আনন্দমঠ সম্বন্ধে এমন কথাও আবার কখন বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে লোকশিক্ষার জন্য সুগায়ক কথকের মুখ দিয়া কথকতার আকারে এই আনন্দমঠের প্রচার হওয়া দরকার। তিনি তাঁহার "ইতিহাসকথা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ -"আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা।··· আজকালকার দিনে কেবল মাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস এমন কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন কি আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন ?"

বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মুসলমান আনন্দমঠের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে পৌত্তলিকতাপূর্ণ বলিয়া আপত্তি তোলে। অথচ কিছু সংখ্যক মুসলমানের এই আপত্তি তুলিবার প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব হইতেই স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি এবং 'বন্দেমাতরম্' সংগীত জাতীয়-সংগীত হিসাবে দেশে চলিয়া আসিতেছিল। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আপত্তিকারী মুসলমানদের অনেকেই এতদিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া ও বন্দেমাতরম্ গান গাহিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়া আসিতেছিল।

মুসলমানরা বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি তুলিলে, কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যায় অল্প হইলেও, মুসলমান সদস্য থাকায়, কংগ্রেস যখন 'বন্দেমাতরম্' সংগীত সত্যই পৌত্তলিকতাপূর্ণ কিনা বিবেচনা করিতেছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট এক বিবৃতি পাঠাইয়া 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে পৌত্তলিকগন্ধী বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কীয় এই বিবৃতি দানের পর তাঁহাকে তখন অনেকেরই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের এরূপ একটি সমালোচনা হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তখন তাঁহার 'কংগ্রেস ও বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"..এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। পণ্ডিত জওহরলাল কলিকাতায় উপনীত হইবার পূর্বেই তাঁহার 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে মত জানিয়াছিলেন কিনা, তাহা প্রকাশ নাই বটে, কিন্তু তিনি যে এই বিষয় রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করিবার জন্যই নির্দিষ্ট দিনের একদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়াই রবীন্দ্রনাথের সহিত যে আলোচনা করিয়াছিলেন, সে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।...

মুসলমানদিগের আপত্তি ধ্বনিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ভক্তদল হইতে প্রস্তাব হয়, 'বন্দেমাতরম্' গানে যদি সর্বপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি হয়, তবে তাঁহাদিগের আপত্তিতে উহা বর্জন করিয়া উহার স্থানে রবীন্দ্রনাথের একটি সংগীত প্রতিষ্ঠিত করা হউক। কোন্ গানটি তাঁহারা জাতীয় সংগীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহাও তাঁহারা বলেন—'জনগণমন'। তাঁহার ভক্তদলের পক্ষ হইতে যখন এই চেষ্টা হইতেছিল এবং তিনি স্বয়ং যৌবনকালে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করায় বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ না করিলে তাহা সঙ্গত ও শোভন হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কেবল পণ্ডিত জওহরলালের নিকটে নিজমত প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু তাহার পর একটি বিবৃতিও প্রচার করিয়া 'বন্দে মাতরমের' ত্রুটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন।..

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকরূপে তিনি আমাদিগের গর্বের বিষয়। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সময় সময় যে সব ভুল করিয়াছেন, সে সব অবজ্ঞা করাও সম্ভব নহে। আমরা তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট ঢাকায় পুলিসের একটি অনুষ্ঠানে গভর্ণর লর্ড লিটন বলিয়াছিলেন :—এ দেশের লোক পুলিসকে বিপন্ন করিবার জন্য ভারতীয় পুলিস কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে আপনাদিগের সম্ভ্রমহানির মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে তাহাদিগের মহিলাদিগকে প্ররোচিত করে।..

এই মিথ্যা ও হীন উক্তিতে দেশে যে বিক্ষোভের উদ্ভব হয়, তাহা অসাধারণ। এবং আমরা ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঐ উক্তির জন্য লর্ড লিটনকে বাঙ্গলার গভর্ণরের পদচ্যুত করিবার কথা বিলাতে হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া লর্ড লিটনকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া অব্যাহতি লাভের সুযোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত লর্ড লিটনের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় তখনও কেহ পায় নাই।

...আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কার্যকরী সমিতি (কংগ্রেসের) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ছিলেন এবং সেই মত তাঁহাদিগের অনেকের মতের অনুরূপ হওয়ায় তাঁহারা তাহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন।

কার্যকারী সমিতির বিবৃতি প্রকাশের তিন দিন পূর্বে (৩০শে অক্টোবর তারিখে) রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি পণ্ডিত জওহর-লালের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"বন্দেমাতরম্ সংগীতটি আমাদিগের জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত কি না, সেই বিষয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয়। আমি সে সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিবার সময় আমার স্মরণ হইতেছে, লেখকের জীবিতকালে প্রথমে ইহার প্রথম কলিতে সুর সংযোগ করিবার সৌভাগ্য আমারই হইয়াছিল এবং আমিই সর্বপ্রথম কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ইহা গান করিয়াছিলাম। ইহার ঐ প্রথমাংশে যে কোমল ভাবের ও শ্রদ্ধার বিকাশ আছে এবং আমাদিগের জন্মভূমির সৌন্দর্যের ও প্রাচুর্যের যে পরিচয় রহিয়াছে, তাহা আমাকে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, কবিতাটির অন্যান্য অংশ ও যে পুস্তকে উহা সন্নিবিষ্ট তাহা হইতে উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। আমার পিতার একেশ্বরবাদের আদর্শে লালিত-পালিত হওয়ায় ঐ সকল অংশের সহিত আমার কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

শাসকরা যখন আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙ্গলা প্রদেশ বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন—তখন আমাদিগের সেই সংগ্রামের সঙ্কটকালে জাতির প্রতিবাদ উপস্থাপিত করিবার সময় এই সংগীত প্রথম জাতীয় সংগীতরূপে প্রচলিত হয়। তাহার পর যে সব ঘটনায় 'বন্দেমাতরম্' জাতির জয়ধ্বনি বলিয়া গৃহীত হয়; সে সকলের সহিত আমাদিগের বহু উৎকৃষ্ট যুবকের যে বিরাট ত্যাগ বিজড়িত, সে সব আজ যখন আমাদিগের উদ্দেশ্যের সাফল্যে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করিবার সময় হইয়াছে, তখন সহজে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা যায় না।

আমি নিঃসঙ্কোচে ইহা স্বীকার করি যে, বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের সমগ্র অংশ—যে পুস্তকে উহা সন্নিবিষ্ট, তাহার সহিত পঠিত হইলে ইহাতে মুসলমানদিগের মনে আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু ঐ সংগীতের যে প্রথমাংশ স্বতঃই জাতীয় সংগীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা যে সর্বদাই আমাদিগকে উহার অবশিষ্ট অংশের বা যে উপন্যাসে উহা ঘটনাক্রমে সন্নিবিষ্ট, তাহার কথা স্মরণ করাইবে, তাহা নহে। ইহা স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রেরণা-প্রদায়ী ভাব লাভ

করিয়াছে। তাহাতে কোন সম্প্রদায়ের বা কোন ধর্মাবলম্বীর আপত্তি হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির প্রথম কথা—তিনিই সর্ব প্রথম 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে সুর-সংযোগ করেন এবং কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনিই সর্ব প্রথম উহার প্রথমাংশ গান করেন। তাঁহার এই বিবৃতি মাত্র আংশিকরূপে সত্য। তিনিই সর্ব প্রথম কংগ্রেসের এক অধিবেশনে উহা গান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতে প্রথম সুর-সংযোগের গৌরব তিনি পাইতে পারেন না। তাহার কারণ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক গৃহে (কাঁটালপাড়ায়) গমন করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ললিত চন্দ্র মিত্র তাঁহার 'বন্দেমাতরম্—স্বদেশ প্রতিমা' নামক পুস্তিকার 'নিবেদনে' নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

'বন্দেমাতরম্ রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন। সেই দিন বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে 'বঙ্গদর্শনের' পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'গান যাহাই হউক বন্দেমাতরম্ দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না, আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন।' তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'

ভট্টাচার্য মহাশয় 'বন্দেমাতরমে' কি সুর সংযোগ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। হয়ত তিনি ইহাতে কোন নূতন সুর দিয়াছিলেন। কিন্তু 'আনন্দমঠে' ইহার যে সুর লিখিত আছে, তাহা তাহারও বহু পূর্বে সংযোজিত হইয়াছিল। ১৩১৯ সালের ভাদ্র মাসের নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছিলেন :—

'যখন 'আনন্দমঠ' সূতিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন ; উভয়ের পাশা-

পাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ্ঞ; বড় টেবল হারমোনিয়ম লইয়া তিনি 'বন্দেমাতরম্' গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিমবাবুকে সুরের খাতিরে সামান্য অদল-বদল করিতে হয়।'...

ইহার পরও...রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনিই এই সংগীতে প্রথম সুর-সংযোগ করিয়াছিলেন।...

তাহার পর একেশ্বরবাদের যুক্তি দেখাইয়া সংগীতটিকে অঙ্গহীন করিবার প্রয়াসের বিষয় আলোচনা করিতে হয়।...

তিনি তাঁহার পিতার একেশ্বরবাদের পরিবেষ্টনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তাঁহার অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই পরিবেষ্টনে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন।...

তাঁহার এই অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রে (১৩১২ বঙ্গাব্দের) 'মাতৃপূজা' শীর্ষক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন :—

'দুর্গা-প্রতিমার প্রতি অঙ্গ যদি আমরা অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, উহার মধ্যে একটি পূরা তাৎপর্য নিহিত আছে। কেন্দ্রস্থলে মহাশক্তি—অর্থাৎ দেশের সমবেত শক্তি শত্রুর দুরধিগম্য দুর্গারূপে সিংহের উপর, অর্থাৎ আত্মবলের উপর—দৃঢ় সংকল্পের উপর—অধিষ্ঠিতা হইয়া অসুররূপ সমস্ত অশুভকে বিনাশ করিতেছেন। এই মহাশক্তির একদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ—অর্থাৎ ঋদ্ধি ও সিদ্ধিবল।... একদিকে যেমন ঋদ্ধি ও সিদ্ধিবল—অর্থাৎ লক্ষ্মী ও গণেশ, তেমনি অপর দিকে সরস্বতী ও কার্তিক অর্থাৎ বিদ্যা ও শৌর্যবল। দুর্গাপ্রতিমার শীর্ষদেশে দেবদেবীর মূর্তি চিত্রিত—এই দেবদেবী ধর্মের প্রতিরূপ।

অতএব আমরা যদি ধর্মকে মাথায় রাখিয়া, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য, বীর্যের অর্চনা করিয়া মহাশক্তির পূজা করি—এই স্বদেশরূপিনী মহাশক্তি প্রতিমাকে আমরা অন্তরে প্রতিষ্টিত করিতে পারি, তাহা হইলেই ইহার বাস্তবিক 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' হয়,—তাহা হইলে এই প্রতিমাকে আর বিসর্জন করিতে হয় না। শ্রীরামচন্দ্র এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়াই রাবণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাই আমাদিগের ভবিষ্যৎদর্শী অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
বন্দেমাতরম্ ।'

ইহাতেও ঐ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ একেশ্বর-বিরোধী ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ বর্জন করেন নাই, এবং ইহার রূপকও কাহাকেও পীড়িত করে নাই ।

বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা 'আনন্দমঠ'-বর্ণিত মাতৃ-মূর্তির বর্ণনার বিশদ ব্যাখ্যা।...

রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার নবীন রূপ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

'আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন, আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী।'

তাহাতে তিনি কি মা'র বর্ণনায় লিখেন নাই—

'ডান হাত তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটনেত্র আগুন বরণ?'

তাহাতে কি নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা মা'র কল্পনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিয়াছিল?...

সেইজন্যই আমরা বলিতে বাধ্য—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যুক্তিসহ নহে।"
(মাসিক বসুমতী—কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৪৪)

'বন্দেমাতরম্' সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার একেশ্বরবাদে লালিত-পালিত হওয়ার কথা বলিলেও, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় কিন্তু তিনি এ কথা মনে করেন নাই।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই বাঙালী সর্ব প্রথম এই বন্দেমাতরম্ সংগীত লইয়া মাতিয়া উঠে। তখন একদিকে যেমন তাহাদের মুখে কেবল

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শোনা যাইত, অপর দিকে তেমনি দেশের সর্বত্র তাহাদের এই গান গাহিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। এই সময় 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে মিশ্র সুর সহযোগে কোরাসে গাহিবার জন্য 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' নামে একটি দলও গঠিত হইয়াছিল। ইহারা দিকে দিকে এই গান গাহিয়া বেড়াইত। এই দলের অন্যতম গায়ক নরেন্দ্রনাথ শেঠ লিখিয়াছেন :—

"আমরা বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গান গাহিয়াছি। দশহরায় গঙ্গাবক্ষে এই গান গাহিয়াছি—জ্যোৎস্নালোকে বাঙ্গলার ফুল-কুসুমিত পল্লীবাটে এই গান গাহিয়াছি—বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতার নয়নে জ্যোতি দেখিয়াছি, অশ্রু দেখিয়াছি, মস্তক অবনত দেখিয়াছি। এই গানের স্নিগ্ধ গভীর তরঙ্গে তারা আত্মহারা হইয়াছে দেখিয়াছি।" (প্রবর্তক—শ্রাবণ, ১৩৪৫)

ভারত গবর্ণমেন্টের নির্দেশে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২, আশ্বিন ৩০) হইতে বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষিত হয়।...এই বঙ্গ-ভঙ্গের দিন বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় শোভাযাত্রা করিয়া বন্দেমাতরম্ গানটি গাহিতে গাহিতে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ এই বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গের দিন রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এই বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের পুরোভাগে ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"৩০শে আশ্বিন কলিকাতায় যে রাখি-বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের সহিত মিশিয়া অংশ গ্রহণ করিলেন। প্রাতে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি ছিলেন।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রটির জন্য রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষ লইয়া গর্ব করিতেও দেখা গিয়াছে। যেমন :—

বঙ্গ-ভঙ্গের সময় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টারের ছুটিতে বরিশাল শহরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলন আহূত হয়। এই রাজনৈতিক সম্মিলনের সঙ্গে একটি সাহিত্য-সম্মিলনও আহূত হইয়াছিল।

ভারতের ইংরাজ গভর্ণমেন্ট তখন প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা

নিষিদ্ধ বলিয়া আইন জারী করিয়া ছিল। কিন্তু বরিশাল সম্মিলনে এই সরকারী আইন অমান্য করিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া অনেকেই সরকারের হাতে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকারী অত্যাচারে সভাও পণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

ঐ বৎসরেই দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে একটি শিল্প-প্রদর্শনী ও তাহার সহিত একটি সাহিত্য-সম্মিলনেরও ব্যবস্থা ছিল।

বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের সাহিত্য-সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মিলন পণ্ড হওয়ায়, তিনি সেখানে তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এবার তিনি কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সহিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভায় আহূত হইয়া 'সাহিত্য-সম্মিলন' নামে একটি ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলা-সাহিত্যের প্রাধান্যের কথা বলিতে গিয়া বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রটি বঙ্গ-সাহিত্যেরই দান।" (সাহিত্য)।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার সর্বশেষে 'বন্দেমাতরম্' দিয়া শেষ করিয়াছেন, এমনও দেখা গিয়াছে। যেমন :—

স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার প্রথম দুই বৎসর তিন মাস রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। এই 'ভাণ্ডারের' প্রথম বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।... রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দেমাতরম্। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এই বন্দেমাতরমের প্রসঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ উপন্যাসে তিনি সন্দীপ নামে একজন মেকি দেশ-সেবক সৃষ্টি করিয়া তাহার মুখ দিয়া অসংখ্যবার বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উল্লেখ করাইয়াছেন।

সেই সন্দীপ অমূল্যর কাছে বলিতেছে—"টাকা যার বাক্সে ছিল, টাকা যে সত্যি তারই, এই মোহটি কাটানো চাই, নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!"

সন্দীপ আবার বিমলাকে তাহার স্বামীর টাকা চুরি করিতে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছে—"যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে।.. বন্দেমাতরং! বন্দেমাতরং এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার ঘরের প্রাচীর খুলবে" মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং।"

সন্দীপ বিমলার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজে নিজে বলিতেছে—"বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে দেব।... জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারিদিকে গর্জন আর ফেনা—সেই নৌকায় এক সঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা।"

সন্দীপের মুখের এই ধরণের কথা ছাড়াও উপন্যাসে মেজোরাণীর মুখ দিয়া বিমলার উদ্দেশ্যে একাধিক বার এই কথাটি আছে—"আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে! ওলো, ও দেবী চৌধুরাণী লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এইরূপ লেখায়, তখন কিন্তু তাঁহাকে অনেকের নিকট এজন্য বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যেমন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্বসরস্বতী তাঁহার "আলোচনা চতুষ্টয়" নামক গ্রন্থে "রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"রবীন্দ্রনাথ যে বলেন, কোনরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হইয়া কেবল আর্টের খাতিরে তিনি 'ঘরে বাইরে' লিখিয়াছেন, এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।.. কেবল আর্টের ব্যাপার, উদ্দেশ্য ইহাতে কিছুই নাই, একথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সন্দীপ চিত্রে তিনি কোন সুপ্রসিদ্ধ বক্তাকে 'প্যারোডি' করিয়াছেন। আবিল প্রণয়-কাহিনী

কিরূপ 'টেন্টালাইজ' করিয়া দেখাইয়াছেন—বন্দেমাতরম্-এর বিকৃত-বিড়ম্বনা করিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির অবমাননা করিয়া দেশের লোকের মনে আঘাত দিয়াছেন।"

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কিছু সংখ্যক মুসলমান পৌত্তলিকতাপূর্ণ বলিয়া শুধু বন্দেমাতরম্ সংগীতেই আপত্তি তুলে নাই, মুসলমান-বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া 'আনন্দমঠ' উপন্যাস সম্বন্ধেও আপত্তি তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার বন্দেমাতরম্ সংক্রান্ত বিবৃতিতে "আমি নিঃসঙ্কোচে ইহা স্বীকার করি যে, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ সংগীতের সমগ্র অংশ— যে পুস্তকে উহা সন্নিবিষ্ট তাহার সহিত পঠিত হইলে ইহাতে মুসলমানদিগের মনে আঘাত লাগিতে পারে"—ইত্যাদি বলিয়া প্রকারান্তরে আনন্দমঠকে মুসলমান-বিদ্বেষক বলিয়াও স্বীকার করেন।

অনেকেই কিন্তু বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে মোটেই মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই। আনন্দমঠে কোন কোন চরিত্রের মুখ দিয়া এ সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর উক্তি আছে, তাহা উপন্যাসে অস্বাভাবিক না হইয়া বরং স্বাভাবিকই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার "আনন্দমঠ ও মুসলমান" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"মুসলমানদিগের 'আনন্দমঠে' আপত্তির কারণ—ইহাতে মুসলমান-বিদ্বেষ সপ্রকাশ। এই আপত্তি যদি সকারণ হয়, তাহা হইলেও তাহা কোন সাহিত্য শিল্প-নিদর্শন নিষিদ্ধ করিবার কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই আমাদিগের মত। সেক্সপীয়রের নাটকে ইহুদীদিগের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর উক্তি কোন কোন পাত্রের কথায় থাকিলেও ইহুদীরা কখনও উহা নিষিদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করেন নাই এবং গিবনের ইতিহাস হইতে ওয়েলসের পুস্তক পর্যন্ত বহু ইংরেজি পুস্তকে মুসলমানদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর মত গ্রন্থকারদিগের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও কোন মুসলমান সে সকল নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হয়েন নাই। আমরা যতদূর সংবাদ লইতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়,—তুর্কী, মিশর প্রভৃতি মুসলমান শাসিত দেশেও এই সকল পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। অথচ যে দেশে মুসলমানরা স্বাধীন নহেন, পরন্তু ইংরেজের অধীন, সেই দেশেই তাঁহারা এইরূপ পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ করিতে প্রয়াস

করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের দৌর্বল্যের হাস্যোদ্দীপক দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

কিন্তু মুসলমানদিগের আপত্তি যে অকারণ এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত, তাহা নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া আনন্দমঠ পাঠ ও আলোচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বরং তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, যে অবস্থায় বাঙ্গলায় কতকগুলি লোকের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদিগের—বিশেষ মুসলমান শাসকদিগের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর উক্তি উক্ত করিয়াছেন, সে অবস্থায় তাহারা তাহা না করিলেই অস্বাভাবিক হইত—সে অবস্থায় লোকের পক্ষে শাসকদিগকে শ্রদ্ধার ও প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাই অসম্ভব। তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় যাহা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বলা যায়—A great outcry arose, not only against the men who had jobbed and blundered but against the system under which they worked." (মাসিক বসুমতী -কার্ত্তিক ১৩৪৪)

রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে পৌত্তলিকগন্ধী এবং আনন্দমঠ উপন্যাসকে প্রকারান্তরে মুসলমান-বিদ্বেষক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেও, বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা (এমন কি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সাহিত্যিক পর্যন্ত) কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-সম্পাদক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মারফৎ বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য গান্ধীজীর নিকট পেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরু গোড়া হইতে রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বাসী থাকায় কিছুই হইল না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কর্তৃক 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের অঙ্গচ্ছেদই ঘটিল। এ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার রবীন্দ্র-জীবনীর ৪র্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

"জবহরলালকে লিখিত জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে পত্র প্রকাশিত হইলে কোন কোন 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ পর্যন্ত হইল। জবহরলাল গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের মত-বিশ্বাসী। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে রচিত 'জনগণমন' আজ স্বাধীন

ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বন্দেমাতরমের যে প্রথম অংশ অসাম্প্রদায়িক সেইটুকুই অন্যতম জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হইয়াছে।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বন্দেমাতরম্ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত-বিরোধীদের কথায় লিখিয়াছেন :—

"কলিকাতায় বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিকেরা সমবেত হইয়া বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গান্ধীজীর নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপর ভার দেন। রামানন্দবাবু দীর্ঘ এক পত্রে বাংলা দেশের মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব কিরূপ তাহা বিবৃত করেন। এই পত্রে তিনি বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণের সুপারিশ করেন।"

প্রভাতবাবু আরও লিখিয়াছেন :—

"রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। তিনি ব্রাহ্ম হইবার পর কখনো প্রতিমাদি পূজা করেন নাই। তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত ; কিন্তু বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে গানটি পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা প্রণোদক নহে, মুসলমান-বিদ্বেষ প্রসূত বা মুসলমান-বিদ্বেষজনক নহে।"

বন্দেমাতরম্ সংগীত 'পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা-প্রণোদক নহে বলিয়া রামানন্দবাবু তখন তাঁহার 'প্রবাসী' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

"...আনন্দমঠে পরক্ষোভাবে মুসলমানের প্রশংসা আছে। যেমন প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের নিম্নলিখিত বাক্যের 'অপূর্ব' কথাটিতে—

'সেই সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। নগর সকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে মুসলমান সম্রাট নির্মিত অপূর্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত।'

সর্বকালীন মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন ব্যাপক মন্তব্য বা উক্তি— বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি আনন্দমঠে নাই। 'রাজসিংহে' তাহা আছে। এই উপন্যাসের উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদন নাম দিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না। মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল।'

যে গ্রন্থকার এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে ধর্মান্ধ মুসলমান-বিদ্বেষী মনে করা অযৌক্তিক।...

ইহা (বন্দেমাতরম্ সংগীত) 'আনন্দমঠ' রচিত হইবার বহু পূর্বে রচিত হয়। সুতরাং আনন্দমঠে যদি মুসলমান বিরোধিতা থাকে, যাহা নাই আমরা বলিয়াছি, তাহা বন্দেমাতরম্ গানে আরোপিত হওয়া উচিত নয়।...

মাতৃভূমিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ, চেতনা আরোপ, অহিন্দু অভারতীয় সভ্য জাতিরাও করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিয়াছে ও করে। ইহা পৌত্তলিকতা নহে। মাতৃভূমিকে নমস্কার করাও পৌত্তলিকতা নহে। কোন কোন মুসলমান বলিয়াছেন, আমরা আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও কাছে নতি জানাই না। ইহা কি সত্য? তাঁহারা কি কোন গুরুজনকে নতি জানান না? কোন প্রভুকে ঝুঁকিয়া সেলাম করেন না? মাতৃভূমি অবশ্য বৈজ্ঞানিকের ভাষায় জড়পদার্থ। কিন্তু জাতীয় পতাকা কি তাহা অপেক্ষাও জড় পদাথ নহে?... কংগ্রেস জাতীয় পতাকাকে সেলাম করার বৈদেশিক রীতি চালাইয়াছেন এবং তাহাতে কংগ্রেসী কোন মুসলমান আপত্তি করেন নাই। অধিকন্তু অকংগ্রেসী কংগ্রেস বিরোধী মোস্লেম লীগ তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তাহা হইলে 'তোমাকে বন্দনা করি' মাতৃভূমিকে বলাতেই কি যত দোষ?...

বন্দেমাতরম্ গানটিতে আছে, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী, বাণী-বিদ্যাদায়িনী'। ইহার অর্থ অনেকে এইরূপ বুঝেন, আমিও তাই বুঝি, 'তুমিই দুর্গা, তুমিই কমলা, তুমিই বাণী,' অন্য কোন দুর্গা, কমলা, বাণী নাই। এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন 'আনন্দমঠ' হইতেই পাওয়া যায়। ইহার শেষ অধ্যায়ে আছে :—

'মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, এ কথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে

একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম, তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম শ্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।"

ইহাতে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পৌত্তলিক ছিলেন না। সুতরাং বন্দেমাতরম্ রচনা করিয়া তিনি পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না। গানটিতে আছে বটে 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে,' ইহাতে ইহা বুঝায় যে, যেমন তুমিই দুর্গা, কমলা, বাণী, অন্য কোন দুর্গা, কমলা, বাণী নাই, তদ্রূপ মন্দিরে অন্য যে-সব দেবতার কল্পিত মূর্তি গড়া হয়, তুমিই সেই সব, অন্য সেই সব দেবতা নাই। তদ্ভিন্ন আমরা অনেক বিখ্যাত মানুষের সম্বন্ধেও ত বলিয়া থাকি, তাঁহাদের মূর্তি দেশের লোকদের বা জগদ্বাসীর হৃদয় মন্দিরে গৃহে গৃহে চিরকাল বিরাজ করিবে। তাহাতে পৌত্তলিকতা হয় না।...

বহু দেববাদ হইতে উদ্ভূত শব্দ ব্যবহার মাত্রই পৌত্তলিকতা নহে। সংগীতের ইংরেজি প্রতিশব্দ music গ্রীক বহু দেববাদ জাত। তদ্রূপ ইংরেজি Jovial ; Saturnine, matrial, Son of mars, Mammonite, Votary of the Muses, Cupid's arrows (বাংলা পুষ্পবাণ) ইত্যাদিও বহু দেববাদ প্রসূত। তাহা হইলেও এই গুলির ব্যবহার হেতু ইংরেজদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। শয়তানে ও বহু ফেরেস্তায় বিশ্বাসও এক প্রকার বহু দেববাদ। কিন্তু সেরূপ বিশ্বাস হেতু, কিংবা মুসলমানী কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাহাকে 'কৌস্তুভমণি' বলিয়া কিংবা মুসলমান অনেক কবি রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা রচনা করায়, কিংবা আধুনিক কোন কোন মুসলমান কবি 'প্রেম বৃন্দাবন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায় কেহ মুসলমানদিগকে পৌত্তলিক বলিলে ঠিক বলা হইবে না।

...কংগ্রেস বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত করিবেন জানিনা। সকল পক্ষের সব কথা শুনিয়া বিচার করিলে কাজটি সুবিবেচিত হইবে।"
প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, বিবিধ প্রসঙ্গ।

বন্দেমাতরম্ সংগীতকে পৌত্তলিকতাপূর্ণ বলিয়া কিছু সংখ্যক মুসলমান আপত্তি তুলিলে, তখন অনেক চিন্তাশীল মুসলমানই আপত্তিকারীদের এই

আপত্তিকে অসার বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে এইরূপ একজন মুসলমান সাহিত্যিক রেজাউল করিম এম.এ. বি.এল মহাশয়ের লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া এখন এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। করিম সাহেব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে, বন্দেমাতম্ সংগীত মোটেই পৌত্তলিকতা পূর্ণ নয় এবং আনন্দমঠ উপন্যাসেও কিছুমাত্র মুসলমান-বিদ্বেষ নাই। বন্দেমাতরম্ সংগীত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বন্দেমাতরম্ সংগীত কোন একেশ্বরবাদীর দৃষ্টিতে আপত্তিকর হইতে পারে না।·· ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী হইতে আরম্ভ করিয়া সংগীতের সর্বশেষ কলিটির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি উঠিয়াছে। বলা হইতেছে, কোন মুসলমানই ইহা গাহিতে বা বলিতে পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যাঁহারা এরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহারা এই কলিগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার একটুও প্রয়াস পাইয়াছেন?...ইহা পৌত্তলিকতার জয়-সূচক বাণী নহে। পৌত্তলিকতার মহিমার গানও ইহা নহে। হিন্দু দেবদেবীর স্তুতিবাদও ইহা নহে। বরং ইহা প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতার প্রতি বক্রোক্তি, হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি ব্যঙ্গের ইঙ্গিত। ইহাতে দেশমাতাকে দেবদেবীর অপেক্ষাও বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুরা যে দেবদেবী—দুর্গা, কমলা ও বাণী দেবীর পূজা করেন, এই সংগীতে বলা হইয়াছে, তদপেক্ষাও বড় হইতেছে দেশমাতা। দেবদেবী অপেক্ষা আমার কাছে বড় দেশ। দেশই আমার দুর্গা, দেশই আমার লক্ষ্মী, দেশই আমার সরস্বতী। এই ভাবটাই অতি পরিষ্কারভাবে ও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে।" (ইস্‌লাম ও বন্দেমাতরম্—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ)

'শকুন্তলা' আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে শকুন্তলা ও মিরন্দা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"উভয়েই ঋষিকন্যা ; প্রস্পেরো এবং বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া অমানুষিক সাহায্য প্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরা-রক্ষিতা। ..

উভয়েই অরণ্য মধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ।...কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা ; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন, লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্‌গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে তাহার লজ্জাও নাই।...অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দার অভাব নাই। এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক।.. মিরন্দা সংস্কার-বিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখ-কাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী, মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয় সংস্পর্শ শূন্য ছিল, কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন চোখে দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্য-হৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—একস্থানে কণ্বের তপোবন, অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত,

ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়-লক্ষণ ও মিরন্দার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে। কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না। অতএব তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক পৃথক কবি প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই হইয়াছে।..

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ২য় বর্ষের (১৩০৯ সাল) আশ্বিন সংখ্যায় 'শকুন্তলা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে তিনি তাঁহার এই প্রবন্ধটিকে তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সুদীর্ঘ শকুন্তলা প্রবন্ধের মধ্যে লেখেন :—

"আমাদের সমালোচকেরা অনেক সময় নাটক-নভেল হইতে তাহার নায়ক ও নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া থাকেন। আসামীকে কাঠ-গড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া যে বিচার, সে বিচার কাব্যের নহে। তাহা রাজার বিচার, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানের বিচার বা ধর্মনীতির বিচার হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচার নহে। কাব্যের নায়িকা কে লজ্জা বেশি করিয়াছে বা কম করিয়াছে, কে আত্মত্যাগ বেশি দেখাইয়াছে বা কম দেখাইয়াছে,.. এ সমস্ত আলোচনা অধিকাংশ স্থলেই অনর্থক।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে আরও বলেন—

"...মিরান্দার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসার জ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই,—আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমন অবস্থায় তুলনায় সমালোচনা বৃথা।...এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁহার প্রবন্ধের কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বা বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পর্যন্ত করেন নাই, তবুও তাঁহার এই কথাগুলি পড়িয়া মনে হইতে পারে, হয়ত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির কিছুটা প্রতিবাদ হিসাবেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

মহাকবি গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে প্রধানতঃ গ্যেটের এই বিখ্যাত উক্তিটি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এই উক্তির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে মধ্যে মধ্যে শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্র লইয়া আলোচনা করিলেও, তিনি প্রধানতঃ সমগ্রভাবে শকুন্তলা নাটকের সহিত টেম্পেষ্ট নাটকেরই তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে প্রধানতঃ শকুন্তলা ও মিরান্দা উভয় চরিত্রের সরলতা, তাহাদের সেই সরলতার গুণগত পার্থক্য এবং সেই পার্থক্য হেতু প্রণয়-নিবেদন ব্যাপারে কে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ। কিন্তু তিনিও তাঁহার প্রবন্ধে শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্রের সরলতা, তাহাদের সরলতার তারতম্য এবং প্রণয়-নিবেদন ব্যাপারে শকুন্তলার 'আভাষ-ইঙ্গিতের' কথাও স্বীকার করিয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে একাধিকবার বলিয়াছেন—"ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন।"..."ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন।"

শকুন্তলা ও মিরান্দা উভয়েরই সরলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"টেম্পেষ্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে,—শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী।"

রবীন্দ্রনাথ মিরান্দার সরল মাধুর্যের কথা বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও মিরান্দার সরলতার মাধুর্যের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার সরলতার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও শকুন্তলার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না।"

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের লেখনী-সংযমের প্রসঙ্গেই কথাটি বলিলেও, তিনি শকুন্তলার প্রেমালাপের 'আভাষ-ইঙ্গিতের' সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাহার অধিকাংশই আভাষে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার প্রবন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :— "তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে।"

আমি পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের কয়েকটি কথা পড়িয়া মনে হইতে পারে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই মনে করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) 'শকুন্তলার' একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন। এই সমালোচনা যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা। তবে এই সমালোচনাটি লিখিবার সময় কবির সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' অন্তর্গত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটি ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম শকুন্তলার চরিত্রের সহিত মিরন্দার (বা অভিজ্ঞান শকুন্তলার সহিত টেম্পেস্‌টের) যে তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহারই অসংগতি এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, 'এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে।' আর বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন যে, 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।' দুই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য যে কত গভীর, তাহা উভয় প্রবন্ধ পাঠ না করা পর্যন্ত বুঝা যাইবে না, আর রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাহিত্য-বিদগ্ধ চিত্তের পরিচয়ও রহিয়া যাইবে অসম্পূর্ণ।"

প্রভাতবাবুর এই উক্তিটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে কোথাও অসংগতি নাই।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি যে দুই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আমি দেখাইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা 'যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা' হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শকুন্তলা ও

মিরান্দার যে সরলতা ও তাহাদের সরলতার গুণগত পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে শকুন্তলা ও মিরান্দার সেই সরলতার কথা স্বীকারও করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন, "একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।" শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্রের সৃষ্টিতে দুইটি চরিত্রে পার্থক্যের প্রসঙ্গেই যে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলিয়াছেন, প্রভাতবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্রের সম্পূর্ণ সাদৃশ্যের কথা বলেন নাই। উভয় চরিত্রে যে বৈসাদৃশ্য বা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা চিন্তা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—একজন কবি শকুন্তলা ও মিরান্দা উভয়ের স্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথা জানিয়া ঐ দুইটি চরিত্র সৃষ্টি করিলে চরিত্র দুইটি পরস্পরের স্বভাবের স্বাতন্ত্র্যবশত যেমন পৃথক পৃথক হইত, কালিদাস ও সেক্সপীয়র পরস্পর আলোচনা না করিলেও পরস্পরের সৃষ্ট চরিত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তো পরিষ্কারই বলিয়াছেন :—

"যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়-লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে। কিন্তু মিরন্দা সংস্কার-শূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না। অতএব তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক পৃথক কবি প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাই হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থেরও প্রশংসা করিয়াছিলেন। মনে হয়, এই দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচিত বা বন্ধুজনের মধ্যে কেহ তাঁহার লেখায় কৃষ্ণচরিত্রের প্রশংসা দেখিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—একি করিলেন ? *

এই কারণেই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক বলিতে পারি না, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি লিখিবার মাত্র ৮।৯ মাস পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের উপর একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিকে তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যান।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা আছে অতি নগণ্যই, কিন্তু আক্রমণ আছে প্রচণ্ড। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যায়, গর্হিত এমন কথাও বলিয়াছেন।

রবীন্দ্র-জীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রবন্ধটির প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা কালে আদর্শ ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা যে উহা পাঠ করিলে মনে হয়, উহা যেন পরিণত ঐতিহাসিক গবেষকের বিজ্ঞান-সম্মত লেখনী-প্রসূত রচনা।' (রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের উপর রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা যে সুষ্ঠু হইয়াছে বা তাঁহার যুক্তিই যে সর্বত্রই সঠিক হইয়াছে, তাহা কিন্তু আমি মনে করি না। এখন একে একে তাহাই আলোচনা করিতেছি :—

* রবীন্দ্রনাথ "একটি পুরাতন কথা" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ সন্দেহ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—"তাই মনে হয়, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই। আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।"

(১) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম মহাভারতের তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতি প্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহুকালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছা মত রচনা।

একথা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচি ভেদে কবিত্ব ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। আবার, একই কবির রচনায় এক অংশ অপরাংশের সহিত কবিত্ব হিসাবে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়; এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐকিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করিবার জন্য তিনটি স্তর বিভাগ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু কোথাও তিনি শুধু কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্তর নির্বাচন প্রসঙ্গের বক্তব্য যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আগে উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর * অনুবর্তী হইয়া বিচার-পূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল, তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবন-বৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বোধ হয়, ইহাই সেই

* মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত নির্বাচনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে সব প্রণালী স্থির করা যাইতে পারে বলিয়াছেন। যেমন একটি প্রণালী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—পর্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনা ভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায় ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত।

চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারত-সংহিতা। * তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, অথচ তাহার অংশ সমুদয় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমার্থিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতি প্রাপ্ত, কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটন-ঘটন-কৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টি চাতুর্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি একজনের রচনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেননা, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে মহাভারত থাকে না, যাহা থাকে, তাহা কঙ্কাল-বিচ্যুত মাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধন শূন্য এবং প্রয়োজন শূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ বিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলংকার বাদ যায়, পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে এবং দ্বিতীয় স্তরে আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন। নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না। এবং মানুষী ভিন্ন দৈব শক্তির দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন, কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল।

* মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

ইহা ভিন্ন মহাভারতের আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া 'বেশ রচিয়াছি' মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে।"

এখানে দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের প্রথম স্তরের রচনাকে শুধু উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণই বলেন নাই, 'বিকৃতিশূন্য'ও বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্ধৃতিতে 'বিকৃতিশূন্য' কথাটি বাদ দিয়াছেন। অথচ ইতিহাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিকৃতিশূন্য' লক্ষণটা একটা বড় লক্ষণ।

তারপর দ্বিতীয় স্তরের কথা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতি-প্রাপ্ত বলিলেও, একথাও বলিয়াছেন যে, সেইসব রচনা পারমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত এবং অঘটন-ঘটন-কৌশল লক্ষণ বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্ধৃতিতে এই কথা দুইটিও বাদ দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্তরের রচনার সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের রচনায় আরও একটি গুরুতর প্রভেদ দেখাইয়াছেন। তাহা হইতেছে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ কোথাও ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচারিত হন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে নানাভাবে তাহা প্রচারিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচন অনুযায়ী প্রথম স্তরের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের যে পার্থক্য তাহাতে শুধু কাব্যাংশের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারই থাকিতেছে না, সেখানে আরও থাকিতেছে—পারমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বের কথা, অঘটন-ঘটন কৌশলের কথা এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা। কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারটা এখানে মুখ্য না হইয়া বরং একটা গৌণ লক্ষণই বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবিত্বের প্রভেদ নয়, ভাষার প্রভেদই হইবে ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়।" এই কথা বলিয়াই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আবার বলিয়াছেন,"মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্বাচন করা প্রভূত শ্রমসাধ্য।"

কিন্তু, প্রভূত শ্রমসাধ্য হইলেও মহাভারত হইতে ভাষার প্রভেদ দেখিয়া

ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা স্থির করা কি সম্ভবপর? মহাভারতের মধ্যে যখন নানা কালের নানা লোকের রচনা আসিয়া জমিয়াছে, তখন একজনের রচনার ভাষার সঙ্গে কি আর একজনের রচনার ভাষার সাদৃশ্য থাকিতে পারে না? বিশেষ করিয়া চতুর প্রক্ষিপ্তকারী রচয়িতারা যখন তাঁহাদের নিজেদের রচনাকে মূল রচনার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে যাইতেছেন, তখন কেহ কেহ কি মূলের ভাষার সঙ্গে তাঁহাদের রচনার ভাষার সামঞ্জস্য রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ—রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের বেলায় যেমন বলিয়াছেন, একই কবির রচনার এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে কবিত্ব হিসাবে তফাৎ হইতে পারে। তেমনি একই কবির রচনার ভাষা এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের তফাৎও তো হইতে পারে।

(২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম যে সকল স্থলে কৃষ্ণচরিত্র হইতে অতি-প্রাকৃত অমানুষিক অংশ বর্জন করিয়াছেন, সে স্থলে কোনো ঐতিহাসিকের মনে বিরুদ্ধ তর্ক উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি মহাভারতের একাংশের সহিত অসংগত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে পাঠকের মন নিঃসংশয় হইতে পারে না।"

মহাভারতের একাংশের সহিত অসংগত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিবার কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয় সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসংগত হয়, যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থান বিশেষে ভীষ্মের পরদার-পরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে যে সব ঘটনাকে ঐরূপ 'একাংশের সহিত অসংগত বলিয়া' ত্যাগ করিয়াছেন, সকল ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার ত্যাগ করার পক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐরূপ ঘটনার পরিত্যাগের ব্যাপারে পাঠকের মন সায় দেয় না, রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলিলেও, তিনি

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত কোন ঘটনায় যুক্তিকে অযৌক্তিক বা ঠিক হয় নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

এখানে কবির কাব্যে, এই সংগতি, অসংগতি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি মতভেদ দাঁড়াইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসংগত হয়।"

আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ছোট কবিদের সৃজনশক্তি নাই, নির্মাণশক্তি আছে, তাহারা যাহা গড়ে, তাহার আদ্যোপান্ত নিয়ম অনুসারে গড়ে, কোথাও তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিতে পারে না।··· মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই।

···খুব সম্ভব খ্যাত অখ্যাত অনেক 'আর্য' বাঙালি লেখকই সরলা-বিমলা-দামিনী-যামিনী নামধেয়া এমন সকল সতী চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন, যাঁহারা আদ্যোপান্ত সুসংগত অপূর্ব নৈতিকগুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্য বল্মীক রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপ-গুলির বহু উর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।···

···সেই কারণেই বলিতেছিলাম, প্রথম স্তরের মহাভারতকার কবি যদি কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মানিতেন না, ইহা সত্য হয়, তবে তিনি যে তাঁহাকে নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণ স্বরূপ গড়িয়াছিলেন, উহা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না। বঙ্কিম মহাভারতের প্রথম স্তর রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া তিনি কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অসংগতি অসম্পূর্ণতা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি, সেই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ যে সংগতি তাহা নহে।

অতএব বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত মন্দ অংশ বাদ দিয়া যে আদিম মহাভারতকারের আদর্শ কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। ···সেইজন্য কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে সর্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয় যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।"

ছোট কবিরা যাহা গড়িবেন, আদ্যোপান্ত নিয়ম অনুসারে গড়িবেন, কোথাও ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিবেন না, একথা স্বীকার করা গেলেও বড় কবিরা সকল সময়ে ইহার উল্টাটাই বা করিতে যাইবেন কেন? তাঁহাদের কি নিয়ম মানিয়া এবং আত্মবিরোধ না করিয়া কাব্য রচনা করিবার ক্ষমতা নাই?

দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক লেখকই যদি আদ্যোপান্ত সুসংগত অপূর্ব নৈতিকগুণের সরলা-বিমলা দামিনী-যামিনী নামধেয়া সতীচরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ কবি মহাভারতকার নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণচরিত্র সৃষ্টি করিতেই বা পারিবেন না কেন?

তৃতীয়তঃ—বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রের অসংগতি বলিয়া যাহা বাদ দিয়াছেন, সেজন্য তিনি তাঁহার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও দেখাইয়াছেন। শুধু অসংগতি আছে, অতএব ইহা বাদ, এরূপ কথা কোথাও বলেন নাই।

একজন উৎকৃষ্ট কবি যে সুসংগত সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকে একটি যুক্তি প্রসঙ্গে স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবিবরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে নানা স্থানের নানা লোকের মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। কোন উৎকৃষ্ট কবি সেই সকল গল্পের মধ্য হইতে তাঁহার কবিত্বের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া লইয়া একটি সুসংগত সুন্দর কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন।'

(৩) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম প্রসঙ্গক্রমে বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন, অথচ তাহার ভালোরূপ মীমাংসা করেন নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কৃষ্ণকে লোকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাই ঈশ্বরের কৃষ্ণরূপে বা মানুষরূপে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা, ইহা তাঁহাকে আলোচনা করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরের

অবতারত্ব, এ বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে যে সব প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখানে সে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং তাহার উত্তর দেওয়াকে অবান্তর বলা যায় না। বরং যাহা করা স্বাভাবিক বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে যত রকমের প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র সে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, তিনি তাঁহার সাধ্যমত উত্তর দিয়াছেন। আর তাঁহার উত্তর যে, অসার বা অর্থহীন হইয়াছে, তাহাও মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব উত্তরের একটিও খণ্ডন করেন নাই, বা তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি দেখান নাই। তিনি শুধু আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সে প্রশ্নটি হইতেছে এই—"এক্ষণে আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি কি আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই ? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা ? বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের অবতারত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাই তিনি এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন—'ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ?'। এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এ দেশের লোকের বিশ্বাস কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।" বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে বা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন কিনা, এই লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এখানে ঈশ্বরের নিজের অবতীর্ণ হওয়ার কথাই আলোচ্য বিষয়, কোন আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারার কথা আলোচ্য নয়। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই।

(৪) রবীন্দ্রনাথের আরও অভিযোগ—"কৃষ্ণের বহুবিবাহ শীর্ষক অধ্যায়ে রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না, ইহাই প্রমাণ করিয়া লেখক সর্বশেষে তর্ক তুলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম এ কথা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, 'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্থ বা এরূপ রুগ্ন যে সে

কোনমতেই সংসারধর্মের সহায়তা করিতে পারে না। তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। ..যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না।...যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে বোনাপার্টকে জসেফাইনের বর্জন-রূপ অতি ঘোর নারকীয় পাতকে পতিত হইতে হইত না, অষ্টম হেন্‌রিকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজিকালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যাহাই বিলাতী তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য উর্ধ্বাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ, আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।'

কৃষ্ণ যখন একাধিক বিবাহ করেন নাই, তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় এই তর্ক নিতান্তই অনাবশ্যক। তাহা ছাড়া তর্কটারই বা কী মীমাংসা হইল, প্রথম স্থির হইল, যাহার স্ত্রী রুগ্ন অথবা ভ্রষ্টা অথবা বন্ধ্যা সে দ্বিতীয়বাব বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপে রুগ্না, ভ্রষ্টা এবং বন্ধ্যার স্বামী সহজে দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই যে সেখানকার উজ্জ্বলালোকে এত পত্নী হত্যা হইতেছে তাহা নহে ; অনেক সময় পত্নীর প্রতি বিরাগ ও অন্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃ হত্যা ঘটনা অধিকতর সম্ভবপর। যদি সে হত্যা নিবারণ করিতে হয়, তবে অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারকেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ধর্মসংগত বিধান বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম, এ কথাটার এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে যাইবে, তখন যেন একটা কোনো কারণ থাকে ; কাজটা যেন অকারণ না হয়। অর্থাৎ যদি তোমার স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম হয়, তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয়, তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পারে—কারণ, সেইরূপ ইচ্ছায় বাধা পাইয়া ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রি পত্নী হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ না থাকিলে বিবাহ করিও না। জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে যুক্তি অনুসারে যে

সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কিনা এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হয় কিনা।"

রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের যে অন্য স্ত্রী ছিল না, একথা বঙ্কিমচন্দ্র জোর করিয়া কোথাও বলেন নাই। মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণের বিবাহ সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, সে সমস্তই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্মিক ভীষ্ম কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত এ কথাটাও কোথাও নাই। আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম।"

এই কথার আলোচনা প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সমাজের বিবাহবিধির কথা তুলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিছক স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মানুরাগ বশতঃই হিন্দুর বিবাহ বিধির সঙ্গে খ্রীষ্টান সমাজের বিবাহ প্রথার তুলনা করিয়াছেন।

এখানে একটি কথা, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত" ইহার আগে "ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই।"—এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করেন নাই। উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে এই পংক্তিটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি। কারণ বোনাপার্ট যে জসেফাইনকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অষ্টম হেনরি যে পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন, সে দারান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে যীশুর নিষেধ ছিল বলিয়াই। পত্নীহত্যার অন্য কারণ থাকিলেও একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কোন অবস্থাতেই এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না, খ্রীষ্টান ধর্মের এই অনুশাসন থাকার ফলেই ইউরোপে অনেক সময় পত্নী হত্যা হইয়া থাকে। অপর পক্ষে হিন্দু সমাজে 'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম

বা অনুচিত হইলেও যেহেতু একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের অনুশাসন নাই। তাই কেহ অকারণেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সক্ষম হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সে তাহার আগের স্ত্রীর প্রতি অবিচার করিলেও দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে হয় না। এই দিক হইতে হিন্দুর বিবাহ-বিধি যে খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা ভাল, এই কথাই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন।

"সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম" বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা হইতে 'অকরাণে' শব্দটাকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ অষ্টম হেনরির পত্নীহত্যার উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করার শুধুমাত্র ইচ্ছাটাও যে একটা 'কারণ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই বলিয়াছেন কি। প্রথমতঃ—সাধারণতঃ পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম অর্থে এই নয় যে, খ্রীষ্টানধর্মের মত সর্বক্ষেত্রেই একাধিক বিবাহ অধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র তো বলিয়াছেন, আগে আমাদের দেশে রাজাদের একাধিক মহিষী ছিল। সেখানে কোন 'কারণ' 'অকারণে'র প্রশ্ন ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ—অষ্টম হেনরির যে পত্নীহত্যার কথা, সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টানধর্মের যদি ঐরূপ অনুশাসন না থাকিত, তাহাহইলে তিনি আমাদের দেশের রাজাদের মত 'কারণ' 'অকারণে'র প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া একাধিক বিবাহ সহজেই করিতে পারিতেন। আর যদি বঙ্কিমচন্দ্রের কথামত অকারণে বিবাহ করিয়া অধর্মই করিতেন, তাহাহইলে তিনি তাঁহার আগের স্ত্রীর প্রতি অবিচার করিলেও, তাঁহার আগের স্ত্রীকে হত্যা করিতে হইত না।

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলিয়াছেন—স্বামীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইল, অনুরূপ স্থলে স্ত্রীকেও দেওয়া যায় কিনা?—বঙ্কিমচন্দ্র স্বধর্মানুরাগ বশতঃই শুধু পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রশ্ন লইয়া ইউরোপীয় বিবাহ-ব্যবস্থার সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ-ব্যবস্থার তুলনা করিয়াছেন। তিনি কি হিন্দু আর কি খ্রীষ্টান কোন সমাজেরই স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহের কথা লইয়া কিছু বলেন নাই।

(৫) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সুভদ্রাহরণ কার্যটা যে বিশেষ দোষের

হয় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক 'মালাবারী' নামক এক পার্শী সম্ভবতঃ যাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্তমান কালের গুটিকয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কীটের দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকিবে—তাঁহার প্রতি একটা খোঁচা দিয়া আর একটা সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন। সে তর্কটারও মীমাংসা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হয় নাই, অথচ লেখক অধীরভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।"

মালাবারী-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছেন— "আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, 'রিফর্মর'ই আদর্শ মনুষ্য এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবরী ধরণের রিফর্মর হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারী ঢং-টাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না; সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।" ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র মালাবারী প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলেন নাই।

এই মালাবারী-রিফর্মর কে এখন দেখা যাক্। ইহার পুরা নাম হইল—বাহারামজী মারওয়ানজী মালাবারী। ইনি একজন সমাজ-সংস্কারক গুজরাটী পার্শী। মালাবারী বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি অনেক দিন যাবৎ 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর' নামক একটি সংবাদপত্রের পরিচালক ছিলেন এবং 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' নামক একটি কাগজের কিছুদিন সম্পাদকও ছিলেন। মালাবারী ম্যাক্সমূলারের "অরিজন এণ্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়ন" পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদ করেন এবং নিজেও 'দি ইণ্ডিয়ান প্রোব্লেম' প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তক লেখেন। মালাবারী বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এবং সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইন প্রণয়নের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র মালাবারী সম্বন্ধীয় যে সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন, সে তর্কটা উঠিতে পারে বলিয়াই তুলিয়াছেন। কেন না তিনি তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে কৃষ্ণের মালাবারী ধরণের 'রিফর্মর' হওয়া উচিত ছিল। আর এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তিনি আদৌ প্রয়োজন বোধ করেন নাই, মালাবারী ঢং-টাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণ্য করেন নাই বলিয়াই। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রেরই বরং একটা

তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কেন না মালাবারী ঢংএর মধ্যে যদি আদর্শ মনুষ্যের কিছু গুণ থাকিত, তাহা হইলে, এই অতি অল্প দিনের মধ্যেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, তাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্তমানকালের গুটি-কয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কীটের দ্বারা জীর্ণ হইত না।

মহাভারতীয় যুগের সমাজে ক্ষত্রিয় অর্জুনের পক্ষে সুভদ্রা-হরণ দোষের হইয়াছিল কিনা, তাহা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কলহ' হিসাবে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সেগুলি হইতেছে এই :—

(ক) "সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে,—তাহা সকল শতাব্দীতে সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোতজমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জমিদারেরা এখনকার ছোট সরকারী গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইয়াছি, ইহা অনেকবার বলিয়াছি।".

(খ) "দ্রৌপদীর ন্যায় সুভদ্রাকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্ বলেন—যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

'হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি। এ বিষয় আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।'

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the king of that district. &c.

সায়নাচার্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন—

"কাম্পিল শব্দেন শ্লাঘ্যো বস্ত্রবিশেষ উচ্যতে।" কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে তিনি সায়নাচার্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা নাই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে; তাঁহাকেই বলিতে হইবে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা। সুভদ্রা শব্দে সামশ্রয়ী মহাশয় এই অর্থ করেন—কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী।..."

(গ) "সুভদ্রা-হরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গলা নাটকাদিতে যে সুভদ্রা-হরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদব সেনার সঙ্গে তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথী হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি, কি তাঁহার পরবর্তী কথক-দিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না।"

সুভদ্রা-হরণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকের সঙ্গে কলহ যদি কিছু থাকে, তাহা হইতেছে এই। ইহার মধ্যে প্রথমটা তো হিন্দু-শাস্ত্রাদির উপর বঙ্কিমচন্দ্রের নিছক শ্রদ্ধা বা অনুরাগ। দ্বিতীয়টা ভুল সংশোধন, তৃতীয়টাও তাই। এই উদ্ধৃত কলহগুলি দেখিয়া মনে হয় না, বঙ্কিমচন্দ্র 'অধীর ভাবে

অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক কলহ করিয়াছেন।' তবে অন্যত্র তিনি অনর্থক কিরূপ কলহ করিয়াছেন, এখন তাহাই দেখা যাউক।

(৬) বঙ্কিমচন্দ্র অসহিষ্ণুভাষায় কলহ করিয়াছেন, অনাবশ্যক কলহ করিয়াছেন, এই কলহ করিয়াছেন কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে বহু বার বলিয়াছেন। এই কলহের কথা লইয়াই আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"বঙ্কিম এই অনাবশ্যক যে সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছে।...অনেক ঝগড়া আছে, যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদপ্রতিবাদেই শোভা পায়, যাহা কোন চিরস্মরণীয় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য। 'পাশ্চাত্য মূর্খ' অর্থাৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন।...সে কাজটাই গর্হিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ। একদিকে এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃত ভাষায় যে-কিছু রচনা আছে, যে-কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি-প্রণীত...অনেক লোকে এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।

এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের একথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোনকালে সভ্য ছিল এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারিজন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত।"

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য তিনি মূলতঃ মহাভারতকে অবলম্বন করিলেও হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ প্রভৃতিতেও যে সব কৃষ্ণ-কথা আছে, তিনি মাঝে মাঝে সে সব লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। আর শুধু তাহাই নহে, দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতরা

কৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন, অনেক সময় তাঁহাদের কাহারও কাহারও মত লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কোন গ্রন্থের কোন ঘটনাকে প্রক্ষিপ্ত ভাবিয়া থাকিলে বা কোন পণ্ডিতের কোন মন্তব্যকে ভুল বলিয়া বুঝিয়া থাকিলে, সে সবের বিরুদ্ধে তাঁহার মত বা যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক পণ্ডিত লেখকই তাহা করিয়া থাকেন। এই বিরুদ্ধ মত প্রকাশের জন্যই সে সব কথা সাপ্তাহিকে স্থান পাইবে, অথচ কোন স্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবে না কেন? বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এ দেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। আর রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, অনাবশ্যক কলহের অবতারণা করিয়াছেন, শুধু শুধু কলহের অবতারণা করিতে যাইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে কাহারও মতকে ভুল বলিয়া ভাবিয়া থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার নিজস্ব মত দিয়াছেন।

এবার 'পাশ্চাত্য মূর্খ' অর্থাৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন দেখা যাক্।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের নিঃস্বার্থ আচরণের কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্থ মাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রুর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

এখানে দেখা যাইতেছে, সকল পাশ্চাত্যকেই নয়, কেবল যাঁহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া অহেতুক কৃষ্ণকে গালাগালি দেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদেরই মূর্খ বলিয়াছেন। স্বীকার করিতেছি, হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা বলা ঠিক হয় নাই, তবুও রবীন্দ্রনাথের কথা লইয়াই বলিতেছি, রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, 'মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে, তাহা মান্য ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা।' রবীন্দ্রনাথের এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু সেই মান্যব্যক্তির ভক্তটির সামনে যদি কেহ, তা তিনি প্রাচ্য দেশীয়ই হউন, আর পাশ্চাত্য দেশীয়ই হউন—মান্যব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া মিথ্যা করিয়া অযথা কুকর্মানুরত, পাপাচারী ইত্যাদি বলিয়া গালি

দেন, তখন সেই ভক্তটি কি করিবে ? সে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে ? যিনি গালি দিতেছেন সেই লোকটিকে কি সে অজ্ঞ বা মূর্খ এ কথাও বলিতে পারিবে না ?

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণতঃ ইউরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি—

'শিশুপালের গালি শুনিয়া ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখনো যে এরূপ পরুষ বচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, ইউরোপীয়দের মত ডাকিয়া বলিলেন না, শিশুপাল, ক্ষমা বড় ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে ইউরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে, কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। পাঠকদের চিত্তকে যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে তাহারা কৃষ্ণের ক্ষমাশক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে।...পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, এই অংশ পাঠকালে একজন ইউরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহীভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমাধর্মের মহিমাকীর্তন যে ইউরোপীয় জাতির প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।' শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন—'হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কিনা মেমসাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচজনে জুটিয়া পাখির মত কিচির-মিচির করি।'

ক্ষণে ক্ষণে লেখকের এরূপ ধৈর্য্যচুতি কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে।”

ক্ষণে ক্ষণেই যে বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহা নহে। তবে কয়েক জায়গায় যে এইরূপ উক্তি আছে, তাহা সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি নয়, ইউরোপীয় জাতির প্রতিই স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন,—এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। কেননা, এই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থেই যথার্থ শ্রদ্ধেয় ইউরোপীয়দের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যথারীতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, এমন নিদর্শন রহিয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব স্বীকারে অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরই একদিকে যেমন অনিচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছা, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সভ্যতার অপব্যাখ্যা বা অপপ্রচারের জন্য স্বধর্মানুরাগী স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই লিখিয়াছেন—“তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোনকালে সভ্য ছিল এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারিজন ভিন্ন তাঁহারা সচারচার প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত।… ফর্গু'সন সাহেব প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলি বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না।” ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এইরূপ ব্যবহারের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে কোথাও কোথাও তাঁহাদের কথার উল্লেখ করিয়াছেন বা তাঁহাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন। এই ইউরোপীয়রাই আবার একদিকে যেমন কৃষ্ণকে না জানিয়া মিথ্যা করিয়া পাপাচারী, কুকর্মানুরত বলিয়া গালি দিত, অপর দিকে তেমনি নিজেদের যীশুর বেলায় শতমুখে তাঁহার ক্ষমাধর্মের কথা গাহিয়া বেড়াইত। এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীরা সর্বত্র যীশুর ক্ষমাগুণের আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়াইত। এই কারণেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ইউরোপীয়দের ‘ক্ষমাধর্ম মহিমা’ প্রচারের কথা বলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে এরূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, নিজের স্বদেশবাসীর প্রতি হিতৈষণা, নিজেদের শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশভক্তিই ইহার মূল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই হিন্দুর ধর্ম, শাস্ত্র, আচার, বিচার সবকিছুই খারাপ,

আর ইউরোপের যাহা কিছু সবই ভাল, এই বলিতে শিখিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের জন্যই স্বজাতিবৎসল, দেশভক্ত, লোকশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের কয়েক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সময়, তখনকার এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচরণ, এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার—এই সব কিছু বিচার করিলে, লোকশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐরূপ উক্তি যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা খুব দোষের হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আর যদিই বা তাহা মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই সময়কার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে এগুলিকে অতি সহজেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এখন উপসংহারে আমার আর একটি কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র লইয়া এইরূপ আলোচনা করিলেও, এই প্রবন্ধ প্রকাশের ৯।১০ মাস আগে, তিনি নিজেই কিন্তু তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত, তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনা বোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। ...সাহিত্যরথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শর চালনা করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি নিজে যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

…এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণ পূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

…বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা. অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ—একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা—যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।…এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।”

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শত-বার্ষিকী ও রবীন্দ্রনাথ

সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৬৮র বৈশাখ) লিখিয়াছেন :—

"১৯৩৮ সনে বঙ্কিম-জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জাতীয় কর্তব্য পালনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ উদ্যোগী হইলেন। তখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি। আমি তাঁহার দূতরূপে পাইকপাড়া রাজবাটীতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় (৮ই এপ্রিল, ১৯৩৮) তাঁহাকে * যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে গেলাম এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার কাব্য-প্রশস্তি প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার শরীর তখন খুবই অপটু।

তিনি আমার হাতেই সেই কথা জানাইয়া এবং বঙ্কিমের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া একটি পত্র দিলেন। বঙ্কিম সম্বন্ধে প্রথম স্বাক্ষর। পত্রটি এই—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। দূর থেকে এইটুকু নিবেদন করি যে যাঁর স্মৃতি আপন মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে আছে, তিনি আপন কীর্তির দ্বারা দেশকে যে সম্মান দিয়েছেন তারি গৌরব যেন আমরা যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে রক্ষা করি। ইতি— ১৩।৩।৩৮

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি কাব্য-প্রশস্তির প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালন করিয়া একটি কবিতা স্বহস্ত লিপিতে আমাকে পাঠাইলেন। সভায় সেই কবিতা আমিই পাঠ করিলাম। নিম্নে কবির স্বাক্ষর সহ কবিতাটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল।"

এই বলিয়া সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক কবিতাটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন।

* রবীন্দ্রনাথকে

রবীন্দ্রনাথের সেই "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতাটি এই—

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যা পার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা,
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অপমান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গ-ভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—"এই কবিতাটির তারিখ ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৮।"

সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতাটির যে

প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কোথাও কিন্তু ঐ তারিখটি নাই।

সজনীবাবু, "কবি কাব্য-প্রশস্তির প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালন করিয়া একটি কবিতা স্বহস্ত লিপিতে আমাকে পাঠাইলেন" বলায় এবং "কবিতাটির তারিখ ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৮" বলায় ইহাই মনে হয় যে, কবি পাইকপাড়ার রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত ৮ই এপ্রিলের সভার জন্যই সভার কয়েকদিন আগে কবিতাটি সজনীবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সজনীবাবু সভায় সেই কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা নহে। এই কবিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী (১০ই, ১১ই ও ১২ই আষাঢ়) বঙ্কিম শত-বার্ষিকী উৎসবের প্রথম দিনের (১০ই আষাঢ়) সভায় পঠিত হইয়াছিল। সজনীবাবু নিজেও তাঁহার ১৩৪৫ সালের আষাঢ় সংখ্যা "শনিবারের চিঠিতে" এই কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া ঐ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও ১৩৪৫-এর শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে এই কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ঐ ১০ই আষাঢ়ের সভায় পঠিত হইয়াছিল, ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও "রবীন্দ্র-জীবনী" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

"কবি যখন মংপুতে সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে কবি পূর্বাহ্নে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ১০ই আষাঢ় (১৩৪৫ ॥ ১৯৩৮ জুন ২৫) সভায় পঠিত হয়। সুতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে শান্তি-নিকেতন আশ্রমেও বঙ্কিম শত-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সেদিন সভায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"আশ্রমে সেদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক

ব্যক্তিগত কথা বলেন। তিনি বলেন, বন্দেমাতরম্ সুর সংযোগে তিনি বঙ্কিমকে শোনান এবং সেই সুরই এখন চলিতেছে। * গানটির প্রথম দুইটি কলি শ্রোতাদের গাহিয়া শুনাইলেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বঙ্কিম জন্ম শত-বার্ষিকীতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর একটি সুশোভন সংস্করণ প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর এই সুশোভন সংস্করণ সম্পাদনার ভার পড়িয়াছিল সাহিত্য-পরিষদের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের উপর। ইহাদের সম্পাদনায় এই বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ এই বঙ্কিম-রচনাবলী উপহার পাইয়া তখন লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর যে শত-বার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বঙ্কিমের সাহিত্য-কীর্তির বাণী-সৌধ বলা যেতে পারে। কী মুদ্রণ নৈপুণ্যে, কী ঐতিহাসিক বিষয়ে, কি তৎকালীন লোকমতের বিবৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিগৌরব রক্ষার এই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমুজ্জল রূপ ধারণ করেছে। এ জন্য এই ব্যাপারের কর্তৃপক্ষ ও সহায়কগণকে বাংলা দেশের হয়ে সাধুবাদ নিবেদন করি। ইতি ১।১২।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* সেই সুরই এখনও সর্বত্র চলিতেছে কিনা সন্দেহ। কেননা বন্দেমাতরম্ সংগীতে প্রথম সুর দিয়াছিলেন বিখ্যাত গায়ক যদু ভট্ট। তারপর বহু ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সুর দিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালের "বঙ্গদর্শন" পাঠের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে যেমন লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্বাবহিনী পশ্চিমাবহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল", তেমনি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বিভিন্ন রচনায়ও "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন :—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা চার বৎসর (১২৭৯-১২৮২) সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাহার পর এক বৎসর বাদে তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব এক লিখিত দানপত্রের দ্বারা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৪ সাল হইতে পাঁচ বৎসর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের আমলে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বঙ্গদর্শনে লিখিতেনই না, নিজের আমলের ন্যায় তখনও বঙ্গদর্শনের উপর নজর রাখিতেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনার কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় আর একবার 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু এই সময় শ্রীশচন্দ্রকে বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় সাহায্য করিতেন এবং পরে তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় বঙ্গদর্শন দুই তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ দিয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। বঙ্গদর্শন পরিচালনার ব্যর্থতার এই গ্লানি শ্রীশবাবু অনেকদিন ভুলিতে পারেন নাই। তাই শেষে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথই বঙ্গদর্শন সম্পাদনার একমাত্র উত্তরাধিকারী, এই চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধ

উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সম্পাদক হইতে সম্মত হন এবং ১৩০৮ সাল হইতে ১৩১২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করিতে গিয়া ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার 'সূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে। সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। ...সম্পাদক এ কথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে। ...লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সমাজ" নামক পুস্তকের অন্তর্গত "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। ...তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়।"

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধন কাজে জীবন যাপন করিয়াছেন।...

অল্পদিন পূর্বে বাঙ্গলা দেশের যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।...

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলন যজ্ঞ আহ্বান করিলেন—সেইদিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্য মহাকালের

অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গ-সাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ সাহিত্য কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শিক্ষার হের-ফের" প্রবন্ধের মধ্যে এক জায়গায় বলিয়াছেন :—

"যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর 'বঙ্গদর্শন' একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের দেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল! য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল! তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ..এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে

তাহার ফল হইয়াছে যে, আজকালকার শিক্ষিত লোক বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের অন্তর্গত "বাংলা-সাহিত্যের ক্রম বিকাশ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

..."বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালীর চিত্তে নব্য বাংলা-সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরেজি ভাষায় যাঁরা প্রবীন তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধেই নয়, তাঁহার উপন্যাসের মধ্যেও বঙ্গদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যেমন, তিনি তাঁহার "গোরা" উপন্যাসে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"বিনয় নূতন-প্রকাশিত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' লইয়া আনন্দময়ীকে শুনাইতেছিল"—*

* 'গোরা' পড়িয়া জানা যায়, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গোরার জন্ম হয়। গোরা কলেজের সমস্ত পড়া শেষ করিয়া তাহারও কিছুদিন পরে দেশের কাজ করিতে গিয়া জেলে যায়! অতএব গোরার বয়স এ সময় যে ২৩।২৪ বৎসর হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, গোরা যখন জেলে সেই সময়ে বিনয় একদিন নূতন প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' লইয়া গোরার মা আনন্দময়ীকে শুনাইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির মধ্যে সময়ের দিক হইতে একটু অসংগতি আছে বলিয়া মনে করি। কেন না বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র চার বৎসর (১৮৭২-৭৫) বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোরার জন্ম হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা কালে গোরার বয়স হয় ১৫ হইতে ১৮।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের কথা হইলে হইতে পারে, কিন্তু নূতন প্রকাশিত বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কথাটি থাকায় যেন ঠিক তাহা বুঝায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সশ্রদ্ধ উক্তি

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, তেমনি তিনি তাঁহার বহু অভিভাষণ ও লেখার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁহার যে কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার এই উক্তিগুলি হইতেও তাহা বেশ বুঝা যায়। এই অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এইরূপ কয়েকটি সশ্রদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এ গ্রন্থ শেষ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের অন্তর্গত "সাহিত্য রূপ" (১৩৩৫) প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি, তিনি গল্প-সাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়-বসন্ত বা গোলেব-কাওলির যে চেহারা ছিল, সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্প-সাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিল, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও কথা-সাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে, জিনিষটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোন একটি প্রাণবানরূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন ; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন ; বাধা অতিক্রম করেছেন। একদিক থেকে এটা অনুকরণ, আর একদিক থেকে এটা আত্মীয়করণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার ? যাঁর আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলছে। ...সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন, সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ

তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথা-সাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন। তাকে ব্যবহার করে বাংলা দেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; সেই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে, তার কারণ বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্যরূপে আনন্দ পেয়েছিলেন এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলা ভাষায় কথা-সাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে। তার কারণ তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে গল্পের কোনো একটা থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুসঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করিনে—ওটা হঠাৎ পুনশ্চ নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ, রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

* *

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য সেইটি অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্‌দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাইনে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষার ভঙ্গীতে আভাষে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিকর, সেইখানেই চন্দ্রশেখর চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কিনা, তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না। আমাদের প্রশ্ন এই যে তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোন একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কিনা। পূর্ব-যুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক চিরকালের প্রশ্নটি

হয়েছে এই যে, হে   কোন্ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন :—

"বঙ্কিম একদিন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষা-ভারতীকে। বলা বাহুল্য, তার ভাব, তার ভঙ্গী, তার ছাঁচ ইংরেজি সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতরা তার ভাষা-রীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই বলে যে, সামাজিক রীতি পদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে অশুচি করে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল, প্রবীন নিষ্ঠাবতী গৃহিনীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন, এই সব বই তাদের পড়ে শোনাতে। বটতলার ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানী ভালো লাগা উচিত নয় বলে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চাশোর্দ্ধ্বম্' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :—

"বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলা দেশের 'মেয়েপুরুষের' মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে ; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পরবর্তীকালে ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল।" (সাহিত্যের পথে)

১৩৪১ সালে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্টিত হয়। এই সম্মিলনের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। তাহা এই : —

"মাইকেল সাহিত্যে যে যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজি সাহিত্যের সৌন্দর্যে-ভাব বিহ্বল। সেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন, বায়রন্, মেকলে,

বার্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলা সাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সবে জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা, কারও ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনও ঘোষিত হয়নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার রস পেয়েছেন, তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হলেও প্রাচীনকালের সংস্কারের বাইরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক্, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। এ কথা মানতেই হবে বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে, কি ভাবে, কি ভঙ্গীতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজি ভাষায় বিদ্বান বলে যাঁদের অভিমান তাঁরা তখনও তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি; অথচ সে লেখা ইংরেজি শিক্ষাহীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি। এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনানীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে—যেন অসূর্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে, কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়লো ছড়িয়ে।"

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষায় যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একস্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলি এই :—

"আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন, তাঁরা যদিচ পড়াশুনায়, চিঠিপত্রে, কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য, ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালী লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে, দূরদেশ ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পর ভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্য সৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেই সঙ্গে গ্রীক, লাটিন আয়ত্ত করে ইউরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভাগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি যে, ধার করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন, যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম পদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালী কল্পনার সাহায্যে মিলটন হোমার প্রতিভার অতিথি সৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই। এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হোতে থাকে।

এই যেমন কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন, তেমনি আধুনিক বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথা-সাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন, তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, কিন্তু যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন, তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল, যেমন দূর গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের

মধ্য দিয়ে, তখন দুই তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান ক'রে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান করে তুলেছেন নিজেরই ভাষা-প্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাঙলা ভাষায় গদ্য প্রবন্ধ ছিল স্কুলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাব-রস-ভোগের ও সত্য সন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব; কেবল অল্প-শিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলা ভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগ প্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাঙলা দেশেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করে, সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে-ফুলে তার পরিচয় আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়া গ্রামের সংলগ্ন নৈহাটী শহরে ১৩৩০ সালের ৮ই ও ৯ই আষাঢ় তারিখে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল। এই সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নৈহাটী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কাঁটালপাড়া নৈহাটীরই সংলগ্ন এবং নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। তাই হরপ্রসাদ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্ত-ভিটাতেই চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইবে। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনের জীর্ণ অবস্থার জন্য তিনি পরে সে সংকল্প ত্যাগ করেন।

সেবার নৈহাটীতে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতি হইয়াছিলেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মহাতাব।

হরপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ দুই দিন ব্যাপী এই চতুর্দশ বঙ্গীয়

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম দিনের সভায় নৈহাটী গিয়াছিলেন। * বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়া নৈহাটী শহরেরই একটি পল্লী জানিয়া রবীন্দ্রনাথ সেদিন নৈহাটীতে গিয়া তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই বক্তৃতাটি তখনকার 'নায়ক' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে এখন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সভা-সমিতিতে যোগদান অসম্ভব। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমির আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তাই আমাকে আসিতেই হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার এই অংশটি ১৩৩০ সালের ১৩ই আষাঢ়ের 'নায়ক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

* এই বৎসর ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম তারিখে কলিকাতায় ভবানীপুরে বিপিনচন্দ্র পালের বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক এক প্রবন্ধ (বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার নব-জাগরণ) পাঠ সভায়ও রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

এই সভার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের একটি message ছিল—সেটি স্বদেশপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথারই প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বিশেষ কোনো গ্রন্থের মেসেজ, ভুলও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। এই লইয়া তর্ক হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে যে আনন্দরূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ লইয়াও হইতে পারে। কবি বলেন, 'আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ, যেখানে তিনি মেসেজ দেন নি, সেখানে উনি সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগত করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই, এজন্য সাহিত্য-সংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি, যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপর সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন—যা দিলেন এ সব কেউ দিতে পারত না।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩)

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঐ ১৩৩০ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখেরই 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে বলিয়াছিলেন :—

"নব্য বাংলা-সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিতেই নৈহাটী-সম্মিলনে আসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গ্রাম্য-সাহিত্যের ভাষাকে বিশ্ব-সাহিত্যের উপকরণরূপে গড়িয়াছেন। টোলের পণ্ডিত ও কর্মীনবীশেরা তাহাকে যে সমস্ত শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, তাহা স্বহস্তে মোচন করিয়া তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল সাহিত্যের বিজয় যাত্রার পথই তৈরী করেন নাই, রথও নিজে গড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে সে যে কত বড় কৃতিত্ব, তাহা আধুনিকেরা বুঝিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের শৈশবে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই আজ অরণ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতএব বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা সাহিত্যের ঋণের পরিমাণ করা যায় না।"